উপন্যাস

ক্ষুধাবৃত্তান্ত

সৈয়দ শামসুল হক

ক্ষুধাবৃত্তান্ত
সৈয়দ শামসুল হক

সকল কথা সকলের কাছে বলা উচিত হয় না। কথার পাত্রভেদ আছে। অঘোর এক সাধুকে যদি হঠাৎ একদিন বুড়িরচরে দেখা গেল, বটগাছের নিচে বসা, সর্বাঙ্গ ছাইমাখা, কোমরে লাল ত্যানা, চক্ষু রক্তবর্ণ, ভাষাও পাহাড়ি, তবে তার কাছে ভক্তিমান হয়ে কত মানুষ ছুটে আসে। দিনমান সাধুর ধুনি জ্বলে ধিকিধিকি, পাশে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল আছে খাড়া, সংসার কী বস্তু তার জানা নাই। এখন তারই কাছে যদি বৌয়ের সঙ্গে রাত্রিকালের আচরণ ঠিকমতো হয় না তুমি সেই সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হও, তার বিধান চাও, রাত্রিকালের বিবরণ সকল খোলাশা মুখে বলে কামরূপ-কামাখ্যার শেকড় তুমি যাচ্ঞা করো, তবে সে বড় অনুচিত হয়। তুমি যে বটগাছের নিচে বসে সাধুকে তোমার ঘরের কথা বলো, ভাষাতেও ঘরের যুবতী সাক্ষাত সমুখে মূর্তিমতী হয়। বৌয়ের বিবরণ সাধুর কাছে ? সংসারত্যাগী সাধুর মন যদি নারীর কল্পনায় উচাটন হয় ?

তোমরা শোনো কি নাই, মুনিরও মন টলে মুনি যদি সুন্দরী নারীর সাক্ষাত পায় ? জলেশ্বরীর কালীবাড়িতে কথকঠাকুরের কাছে এ সকল বিবরণ কত শোনা আছে। হাজার বছর তপস্যা করে মুনি এখন স্বর্গের রাজা হয়-হয়, বেসামাল হয়ে দেবতারা তখন অপ্সরী পাঠায়। নারীর গর্ভ থেকে জন্ম নেয়ার পর জীবনে কোনো দ্বিতীয় নারী দেখে নাই মুনি, কিন্তু দেহের কাছে শিক্ষা লাগে না, দেহ নিজেই নিজের শিক্ষা পায়, সেই দেহের মধ্যে জাগরণ হয়, রক্তের ভেতরে কামনা টলটল করে ওঠে। জটাজুটধারী মুনি তপস্যা ছেড়ে বলে ওঠে, কে তুমি ? তোমার স্থানেই স্বর্গ আছে বলে বোধ করি! তারপর যা হয়, এক সহবাসেই মুনির হাজার বছরের তপস্যা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

জগতে ভালোমন্দ কত কথা। ভালো কথাও অনেক আছে, ভালো কথা বলেই তা দশজনাকে বলার নয়। সাতদিনের অনাহারী মানুষকে একবেলা কেউ পেটভরে খাওয়াল, সে-কথা দশজনকে তুমি বলবে ? উপকারীর উপকার গোপন রাখার আদেশ আছে। কার আদেশ ? উপরওয়ালার আদেশ! কিন্তু কে শোনে ? কুঞ্জবাবুর ব্যাটার বৌ তোমাকে খিড়কি দুয়ারে বসিয়ে পেট ভরে খাইয়েছে, দশজনের কাছে সেই সংবাদ না জানালে ভোজন তোমার হজম হয় না! এত ভালো মানুষ আর হয় না! বাজারে তুমি ঢ্যাঁড়া পিটে দিলে, আহ্লাদ করে সবাইকে জানালে। তারপর দ্যাখ-না-দ্যাখ কী হলো ? কুঞ্জবাবুর বাড়িতে ভিখারি আর অনাহারী মানুষের ঢল নেমে পড়ল।

কুঞ্জবাবু কৃপণের কৃপণ, তার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। বাড়ির বাইরে ভিড়ের সংবাদ পেয়ে রক্তচক্ষু কুঞ্জবাবুর, ছুটে এলেন।

তফাৎ, তফাৎ সব! হারামজাদার দল!

পায়ের খড়ম তুলে মারের চোটে ভিড় ভাগালেন কুঞ্জবাবু। তারপর ?

তারপর বাড়ির ভেতরে গিয়েই ব্যাটার বৌকে লাঠিপেটা করলেন আচ্ছাসে। শ্বশুর বলে জ্ঞান নাই। ভাতের ওপর হামলা শুনেই ব্যাটার বৌ তার জানের শত্রু। লাঠির চোটে ব্যটার বৌ মাথা ফেটে অচেতন!

এখন তবে বলো, এটা কি তোমার উচিত কাজ হয়েছিল ? ক্ষুধার মানুষ তুমি খেতে চেয়েছ, একজন তোমাকে খেতে দিয়েছে, আল্লার কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করে রাস্তায় নেমে পড়ো, তা নয়, দশজনকে তুমি বলতে গেলে! উপকারীর উপকার এইভাবে শোধ দিলে হে!

হাঁ, তবে ক্ষুধার কথা। জগতের শত কথার মধ্যে এই এক কথা। আজ ক্ষুধার কথা হবে। শিশু মায়ের কাছে ক্ষুধার কান্না ধরে, গৃহস্ত বাড়ি ফিরেই 'ভাত দে' বলে হুঙ্কার ছাড়ে, অতিথি এসে পাত পাড়ে, ভিখিরি দরোজার কাছে সানকি পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সকল সংসারে তো বিরল নয়। ভাত নিয়েও তো কত ভাবের কথা মানুষ বলে। ভাত দিবার মুরোদ নাই, কিল দিবার গোঁসাই! তবে বুঝি পিঠের ওপর কিলও সহ্য হয়, স্বামী যদি ভাত দেয়! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না! কাক তো হাজারে হাজার, কিন্তু ভাতই যদি না থাকে তবে ছড়াবে তুমি কী! মঙ্গার দেশে ভাতের অভাব, সেই দেশে ভাত নয় কেবল ভাতের কথাটাই যদি উত্থাপন করো চোখের পলকে মানুষে সড়ক সয়লাব হয়ে যাবে। কই ভাত! ভাতের কথা কইলে কাঁই! কোন্‌ঠে হয় ভোজন!

তবে জেনে রাখো, মঙ্গার দেশে ভোজনের কথা তোলা ঠিক নয়। কুঞ্জবাবু না হয় তার বাড়ি সামাল দিলেন, তল্লাট সামলাবেন কী করে ? ভোজনের কথা একবার কানে শুনলেই হয় অনাহারীর ভিড়ে জলেশ্বরীর সকল পথ বুঁজে যাবে। মঙ্গা কি যেমন তেমন ? পাগলা হস্তির মতো মঙ্গা। পায়ের নিচে দুনিয়া বিনাশ। জলেশ্বরী টাউনের কথা ছেড়ে দাও, টাউনের লোকেরা মঙ্গার কতটুকু জানে! মঙ্গা আছে বুড়িরচরে, হস্তিবাড়িতে, নবগ্রামে, মান্দারবাড়িতে, ইন্ডিয়ার বর্ডার সেই হরিষালে। তামাম মুলুক জুড়ে মঙ্গার পর মঙ্গা। সেই মঙ্গার দেশে জন্ম হয় এক মানুষের, আজ তারই কিছু কথা হবে।

আমরা বলব কী, নিজমুখেই সে নিজের কথা বলে। ভোজন যদি দাও তাকে, ভোজনে বড় হুতাশ তার, জগত তার কাছে কিছু নয় ভোজনের চেয়ে, দশজনের ভাত একজনে খায়। শুধু কি তার ভোজনের এত নাম ? আরো আছে। চেহারাটি তার ছবির মতো। লাখে এমন চেহারা এ তল্লাটে কেউ কখনো দেখে নাই। আশ্বিনে পূজার সময় মা দুর্গার সাথে যে তার ব্যাটাও আসে ময়ূরের পিঠে চড়ে, সেই কার্তিকের ছবিও ম্লান হয়ে পড়ে কপিল যখন পূজাবাড়িতে এসে দাঁড়ায়, খিচুড়িভোগের জন্যে পাত পেড়ে বসে যায়। যুবতী নারীরা আড়চোখে নিমেষহারা তাকিয়ে দেখে কপিলের রূপ। যুবকেরা পরাজিত বোধ করে তার কাছে।

ভোজনের পর কপিলের মুখ খোলে। ঢেঁকুরের পর ঢেঁকুর তুলে পেটের ওপর হাত চাপড়ায় যেন এখনো ক্ষুধা মেটে নাই, কিন্তু না, ভাত-শান্ত সে নিজের কথা বলতে থাকে। বলেই চলে। বলার কোনো থামাথামি নাই। কতক তার বিশ্বাস হয়, কতক হয় না। আমরা বেশ মজা করেই কতবার তাকে ভোজনে ডেকেছি, একবার চড়ুইভাতিতেও নিয়ে গেছি। নদীর ওপারে ঝাউবনে হবে রান্নাবাড়ি। গেছি আট দশজন, চাল-ডালের বস্তার ওজন আধ মন! আমাদের সঙ্গে সে আছে যে!

নাম তার কপিল মামুদ। মঙ্গার কোলে জন্ম, জন্ম থেকেই মঙ্গা তার পেছন ছাড়ে না। তামাশাটা দ্যাখো। সেই ঝাউবনে চড়ুইভাতির পাহাড় সমান খিচুড়ি ভোজন শেষ করে কপিল হঠাৎ চিৎ হয়ে পড়ে। আমরা তার খাওয়ার তামশা দেখছিলাম, চিৎ হয়ে পড়তে দেখে ভয় পেয়ে যাই। আরে সে কি মরেই গেল নাকি ? চোখও যে বুঁজে ফেলল!

পরক্ষণেই চোখ খুলে খলখল করে হাসতে হাসতে কপিল বলে, মরি যাই নাই গো! মরণ হামার এত সহজে আসিবার নয়! ভাব দেখানু হে! জানেন কি তোমরা, মঙ্গা হামার সাঙ্গা করা! হয় হয়। মঙ্গা যাকে ভাতের অভাব বলিয়া জানেন, ভিক্ষার দ্যাশে নাইভিক্ষা বলিয়া জানেন, সেই মঙ্গা! বাজার মসজিদের ইমাম সাহেবে কয়, স্বামীর পায়ের নিচে ইস্তিরির বেহেশত। মুঁই দ্যাঁখো, মোর স্থান হামার সেই সাঙ্গা করা মঙ্গার পায়ের তলায়। কালীবাড়িতে ঠাকুর দ্যাখেন নাই ? মহাদেবের বুকে পাও দিয়া খাড়া হয়া আছে কালী। কালী তো জিভ কাটিছে শরমে। লম্বা লাল জিভখানা তার। হামার মঙ্গাকালী জিভ কাটে না, কলকল করিয়া হাসে। হাসিতে হাসিতে পাও দিয়া বুকে হামার ঠোকর মারে আর কয়, চিৎ হয়া আছিস যে, ক্ষুধা তোর মেটে নাই, আরো খা! আরো খা!

আমরা তার কথা শুনে মজা পাই। কপিলের কথা শুনে জলেশ্বরীর বাজার মজা পায়। বাজার যখন ভাঙে, হাট যখন শেষ হয়,

ব্যাপারীরা পণ্যের পাহাড় গুটিয়ে টাকাপয়সার হিসাব শেষ করে তবে জগতের দিকে চোখ মেলার অবকাশ পায়, কপিল তখন তাদের কাছে ঘনিয়ে বসে। ভোজনেরও নাম আছে, চেহারারও দাম আছে তার, যদিও সে চেহারা এখন বহুকাল আগেই গত। তবু রাজবাড়ি বিরান হয়ে গেলেও পথচলতি লোক রাজবাড়ির সামনে এসে হাঁ করে দাঁড়ায়, ভাঙাস্তূপের ভেতরেও তারা হাতিশাল ঘোড়াশাল জমিদারের মাথায় তাজ দেখে ওঠে।

ব্যাপারীরা তাকে খাতির করে বসায়। কেউ তাকে একছড়া কলা দেয় কি চা-বিস্কুট দেয়। মুহূর্তে এক বোয়াম বিস্কুট শেষ, একছড়া কলা পেটের ভেতরে, গেলাশের পর গেলাশ চা খেয়ে চলে কপিল। ব্যাপারীরা তার খাদকরূপ দেখে হালকা তরাসের ভেতরেও তামাশার স্বাদ পায়। কপিল তখন মঙ্গার গল্প করে। আলু পটল চাল ডাল সামগ্রীর পাহাড়ের ভেতরে তার মঙ্গার গল্প, শাস্ত্রকথার গল্প বলেই বোধ হয় ব্যাপারীদের।

সে বলে, মায়ের বুকে তো দুধ নাই, তবে জীয়ন্ত মানুষের দেহে অক্ত তো থাকে! মায়ের প্যাট হতে পড়িয়া মায়ের বুকে দুধের স্বাদ মুঁই পাঁও নাই। তার অক্তের স্বাদ এলাও মুখে লাগি আছে।

আমাদের জলেশ্বরীতে যেমন জবানদোষ— রক্ত উচ্চারিত হয় অক্ত রূপে। র-এর বদলে ওই অ-এর কারণেই হয়তো রক্তের ভীষণতা আমাদের ধাক্কা দেয় না, অক্ত শব্দটি মাতৃদুধের বিকল্প রূপে সহনীয় হয়ে ওঠে।

কপিল মামুদ পেট থেকে পড়েই কপিল মায়ের বুকের কোষ টেনে টেনে রক্ত পান করে। মঙ্গার দেশে নারীর বুকে দুধ নাই। দুধ ওঠে না, রক্ত ওঠে। সেই রক্তপান করে করে কপিল মামুদ শিশুকালের হামাগুড়ি ছেড়ে একদিন পায়ের ওপর খাড়া হয়ে ওঠে।

ভোরের আলো যখন পুবদিকে আঁধারকে সোনালি হাতে ঘষে ঘষে মুছতে শুরু করে, উদিত সূর্যের দিকে মুখ করে কপিল এই জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে। টলমল তার পা, দুধ যাকে পুষ্ট করে নাই তার পায়ে জোর আসবে কোথা থেকে! টলমলো পায়ে সে বুড়িরচরের প্রান্তর ভাঙে। কাছেই জলেশ্বরী টাউন, টাউনের দিকেই বা যেতে আছে সে।

শহর বা গ্রাম তার কাছে জানা নাই। রাস্তায় মানুষ যদি দশদিকে যাত্রা করে দেখা যায়, তবে তারো আছে যাত্রা। যাত্রায় সে নেমে পড়ে। রেললাইন বরাবর হেঁটে যায় কপিল। এমন অনিন্দসুন্দর বালকশিশু দেখে লোকেরা ক্ষণেকের জন্যে যাত্রা ভুলে যায়। থমকে দাঁড়ায়। বালককে একবার দেখে, আরবার চারদিক দেখে। বালক একা। এমন ফুটফুটে বালক যার, কোন্ সেই হতভাগী মা তাকে চোখে চোখে রাখে নাই ? একজন কেউ তাকে জিগ্যেস করে, বাপু রে, তোর বাপো মা নাই ? কোথা হতে আসিস তুই, কোথায় বা যাইস ?

আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই মানবযাত্রার সার কথাটি শুনে। কোথা থেকে আসা আর কোথায় বা যাওয়া ? কিন্তু সে বোধ শিশুর তখনো হয় নাই। শিশু এক হাত তুলে পেছনের দিকে অনির্দিষ্ট ইঙ্গিত করে। প্রশ্ন যে করে, সে পেছনে দূরের দিকে তাকায়। গ্রামের পর গ্রাম। কিন্তু কোন গ্রাম ? প্রশ্নকারী অপেক্ষা করে। কিন্তু কোথায় সে চলেছে তার দিকনির্দেশনা দেবার মতো শিশুর তখনো বয়স হয় নাই।

বালকের হাতের লক্ষ্য ঠাহর করে প্রশ্ন হয়, টাউনের দিকে ? টাউনে কি যাবু রে ? টাউনে কাঁই আছে তোর ?

কাঁইও নাই।

নাই ?

শিশু মাথা নাড়ে সজোরে। তখন প্রশ্নকারী তাকে হাত ধরে রেললাইনের ধারে ঘুমটিঘরের ছায়ায় নিয়ে যায়। লোকটি বুড়িরচর-জলেশ্বরী সড়কের ওপর রেলের ঘুমটিঘর দেখেশোনে।

বাজারে যাওয়ার পথে একা আচমকা এই বাচ্চাটাকে দেখি। তোমরা কি জানেন কার বাচ্চা ?

ঘুমটিওয়ালা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বালকের রূপ দেখে। প্রশ্ন তার কানে পশে নাই।

আগে কখনো দেখেন নাই ?

ঘুমটিওয়ালা ঘোর ভেঙে উঠে স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বলে, না। দেখি নাই।

খোঁজ করি দ্যাখো তো বাহে, কার ছাওয়া ? হামার টাইম নাই। বাজারে যাই।

লোকটি বাজারের পথ ধরে, যেতে যেতেও ফিরে ফিরে তাকায়। আহা, কার বাচ্চা হে!

ঘুমটিঘরের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখণ্ড জমি। একপাশে ডালিম গাছ। ডালিমের লাল ফুল। ন্যাকড়ায় জড়ানো কয়েকটা ডালিম ঝুলে আছে গাছের ডালে। ন্যাকড়ায় জড়ানো, পাছে কাকপক্ষী না খায়। শিশু হাত বাড়ায়। এবার আর অনির্দিষ্ট নয় তার সংকেত। এবার সে জানে সে কী চায়। সে বলে, খামো। ওই ফল খামো।

ঘুমটিওয়ালা প্রাণে ধরে ডালিমগুলো কাকপক্ষীর হাত থেকে রক্ষা করছিল এতকাল। এই ফল পাকলে হাটে যদি তোলা যায়, বাবুরা মিঞারা নগদ টাকায় কিনে নেবে। পাকার সময় তো হয়ে গেছে প্রায়। কোনো কোনো ডালিমের গা ফেটে সুন্দরী নারীর দাঁতের মতো রহস্যের হাসি ধরে আছে দানা। বাবুরা শখ করে বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাবে। মিঞারা বেহেশতের মেওয়া জমিনে ফলেছে বোধে আহ্লাদ করে খাবে। কিন্তু শিশু, এই শিশু বৌয়ের কিবা বোঝে আর বেহেশতের মেওয়ার সংবাদ কী রাখে! সে হাত বাড়ায় ডালিমের দিকে।

ঘুমটিওয়ালার বুকে নহর বহে যায়। এ নহর স্তম্ভিত হয়ে কোথায় থাকে কে জানে, হঠাৎ একদিন খুলে যায়। তড়িঘড়ি একটা ডালিম ছিঁড়ে শিশুর হাতে দেয় ঘুমটিওয়ালা। রেলের ধারে বাঁশের তৈরি বেঞ্চ, কতকাল বসে বসে চিকন উজ্জ্বল হয়ে আছে বাঁশের বাতাগুলো, সেই বেঞ্চের ওপর শিশুকে সে হাত ধরে বসিয়ে গাঢ়স্বরে আবার জিগ্যেস করে, মাও নাই তোর ? বাপো নাই ?

কপিল মাথা নাড়ে। কপিল এখনো মাথা নাড়ে, যখন এই গল্প সে বলে। সে বলে, ডালিমের সেই স্বাদ হামার মুখে লাগি আছে। মায়ের বুকের মতো ডালিম। কামড় দিয়া দ্যাঁখো, দুধের মতো তো বরণ নয়! অক্তের বরণ! ডালিমের রস নয়, অক্ত! সেই অক্ত খায়া সেইদিন মায়ের কথা মনে পড়িছিলো হে!

মুহূর্তে একখানা ডালিম শেষ করে আবার শিশু হাত বাড়ায়। আবার তাকে আরেকটা ডালিম ছিঁড়ে দেয় ঘুমটিওয়ালা। তারপর আবার একটা।

শিশুর ঠোঁট গড়িয়ে ডালিমের রক্তলাল রস পড়ে। হাত মাখামাখি হয়ে যায়, যেন রক্তেই। কোনোদিকে দৃষ্টি নাই তার। ডালিমের দানা খোঁটারও সময় নাই তার। চাপড়ে চাপড়ে ডালিম ভেঙে সে আস্ত মুখের মধ্যে ঠেসে দিতে থাকে।

আহা কতকাল কিছু খায় নাই শিশু। ঘুমটিওয়ালা বলে, হামার ব্যাটা নাই রে। একবার মোকে বাপ বলিয়া ডাক। কতকাল বাপ ডাক শোঁনো নাই।

শিশু সজোরে মাথা নাড়ে। না। বাপের কোনো প্রয়োজন নাই তার। বেঞ্চের ওপর থেকে নেমে সে দৌড় লাগায়। ঘুমটিওয়ালা পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকে তাকে, শিশুর নাম তার জানা নাই, 'ও বাপ, বাপজান' বলে সে ডাকতে থাকে। শিশু আর ফেরে না। জলেশ্বরীর দিকে সে উধাও হয়ে যায়। তার শিশু পায়ে ধুলো ওড়ে কাঁচা সড়কের। ট্রেন আসার হুইসিল শোনা যায় তখন। গগন চিরে দিয়ে হুইসিল পার হয়ে যায়। চাকায় চাকায় ঝমঝম শব্দ ওঠে, জগতের সব শব্দ সেই শব্দে চাপা পড়ে যায়।

আমরা শুনেছিলাম বলে মনে পড়ে, জলেশ্বরীর এও এক শহর-সংবাদ, বাজারে গল্প যে, সেই ঘুমটিঘরের লোকটার ব্যাটা ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে। যে-মানুষ ঘুমটিঘর পাহারা দেয়, ট্রেন আসার সময় হলে শিকল বেঁধে রাস্তা আটকায় যেন মানুষ না কাটা পড়ে, সেই মানুষটারই নিজের ব্যাটা কিনা কাটা পড়ে ট্রেনের তলায় ? মানুষেরা মাথা নাড়ে।

হয় হয়, বাহে, সাপের কারবার যার সেই ওঝার মরণ যে সাপের দংশনেই হয়।

কপিলের তখনো জন্ম হয় নাই, পেটের মধ্যে অপেক্ষায় আছে, সেই তখন কপিলের বাপ উধাও হয়ে যায়। বৌয়ের পেট ফোলা দেখেই তার বুদ্ধিনাশ! মাথায় বাজ! সন্তানকে খাওয়াবে কী ? নারীরা তো এমন, খাও না খাও, যৌবনকালের শরীর বড় শলশলা, ভরভরা। সেই যৌবনের নারীও তখন আর তার কাছে বিষয় থাকে না, ভাতের চিন্তা রাজা হয়ে বসে। সেই রাজার মুখ কতকাল দেখা যায় ? কতকাল তার কঠিন চেহারা সহ্য করা যায় ?

কপিলের বাপ নিঃশব্দে একদিন বুড়িরচর থেকে নিরুদ্দেশে যায়।

কেউ বলে সে ঢাকা গেছে, ঢাকায় এখন সে রিকশা চালায়। কেউ বলে ইন্ডিয়ায় পার হয়ে গেছে, যাবে না কেন, ইন্ডিয়া বড় দুধের দেশ। আবার কেউ বলে, নয় হে নয়। রাতের অন্ধকারে সেই দুধের দেশে যাওয়ার কালে ইন্ডিয়ার মিলিটারির গুলিতে তার জীবন শেষ হয়। মঙ্গার দেশের মানুষ, সেই তার ক্ষুধা মিটে যায় জন্মের শোধ, বর্ডারে তার লাশ কুকুর শেয়ালে খায়। আল্লার পয়দা শেয়াল কুকুরেরও ক্ষুধা আছে, মানুষই যখন ভাত পায় না, তবে সেই মানুষ যদি লাশ না হয় তবে তারাই বা কী খায়!

কপিল একটু বড় হয় কি হয় নাই, তখনো রাস্তাসড়ক সে চেনে নাই, আমগাছ কি জামগাছ তার বোধ নাই, ঘুটঘুটে অন্ধকার কি ফটফটে জোছনা, জোছনায় কি পরীই নেমেছে না অন্ধকারে পাহাড়ের মতো মহাদেব হঠাৎ খাড়া হয়ে আছে চৌরাস্তায়, কপিলের তখনো কল্পনার দৌড় এতদূর হয় নাই, এমনকালে তার ফুলমনি মা নবীউল্লার সঙ্গে উধাও হয়ে যায়। উধাও হয়ে যাওয়ার ধরনটা যেন মহামারীর। একবার কাউকে ধরলো তো একে একে কতজনকে। চারদিক থেকেই তো অবিরাম উধাও হয়ে যাবার সংবাদ। এ সংবাদ নতুন কিছু নয়। কিন্তু কে এই নবীউল্লা যার সঙ্গে ফুলমনি পালায় ? না, অধীর হলে চলে না। মানুষের এই এক দোষ— অধীরতা! নবীউল্লার কথা একটুপরেই হবে। এখন তার নামখানা কেবল জেনে রাখি।

কপিলের নাম বড় হাউস করে রেখেছিল ফুলমনি। বুকে দুধ না থাকলেও জননীর মায়া বলে কথা। সন্তানের মুখ জননীর কাছে পিপাসার পানি। ফুলমনি কবে বোধহয় জলেশ্বরীর কালীবাড়ি গিয়েছিল। সেখানে কপিলমুনির বিবরণ শুনেছিল কথকঠাকুরের কাছে। মুনিঋষির বিবরণে তো পেট ভরে না, খাদ্য চাই। সেদিন কালীবাড়িতে ছিল পরব কি উৎসব, খিচুড়ির আয়োজন ছিল। সেই খিচুড়ির লোভে লোভে কথকঠাকুরের দীর্ঘ কথকতা শোনা। কানে কিছু পশে নাই।

পেটের মধ্যে ক্ষুধার পাক। ক্ষুধা একটা সাপ। সেই সাপ পেটের মধ্যে বিড়া পাকায়, বিড়া খোলে, মুহূর্তে আবার বিড়া পাকায়। তারই মধ্যে কথকঠাকুরের মুখে কপিলমুনির বারবার নাম। অত ক্ষুধার মুখেও বড় মিঠা লাগে সেই নাম। কপিলমুনি! সন্তানের জন্ম হলে সেই নামে সে নাম রাখে শিশুর। কপিলমুনি রাখারই সাধ ছিল তার, কিন্তু পাড়ার হাফেজ মোল্লার কাছে দোয়া নেবার কালে সেই মোল্লা রক্তচক্ষু ধরে ওঠে, হিন্দুর নামে নাম! দোজখেও তোর জায়গা হবার নয়!

জেদ ছিল ফুলমনির।

তবে মুনির অংশ বাদ দেন, খালি কপিল কয়া ডাকেন। আল্লার কাছে ডাক ডাকিয়া ছাওয়ার মস্তকে ফুঁক একটা দিয়া দেন।

ফুলমনি আস্ত একটা রূপার টাকা এনেছিল মোল্লার কাছে দোয়ার হাদিয়া দিতে। এই টাকাটা সে বিয়ের পর শ্বাশুড়ির কাছ থেকে পেয়েছিল। কোনকালের মহারানির ছবি আঁকা টাকা। রূপার টাকা। এত দুঃখ এত অভাবেও সে কোনোদিন সে টাকা ভাঙে নাই। সেই টাকা হাতে পেয়ে হাফেজ মোল্লা নরোম হয়েছিল।

যা তবে, আর কী করা! কপিলটাও তো মুসলমানী নয়, তারপরও জেদ তোর, হউক তবে ব্যাটার নাম তোর ওই হিন্দুর ঘরের কপিলই রাখি দিলোম। তবে সঙ্গে মামুদও দিলোম। কপিল মামুদ। বাচ্চার নাম কপিল মামুদ, কী কইস ?

আল্লা আপনার ভাল্ করিবে।

ফুলমনির মনে কি তখন কথা একটা উঠেছিল, আল্লার ঘরে হিন্দু-মোছলমান নাই ? কপিলের মাথায় বুকে মুখে হাফেজ মোল্লার দোয়াপড়া ফুঁ সত্বেও ফুলমনির কাছে তা যথেষ্ট মনে হয় নাই। কপিলকে নিয়ে ফেরার পথে, আমরা কল্পনা করি, ব্যাটাকে বুকে চেপে ধরে কত না ফুঁ দিয়েছে ফুলমনি। যেন, যদিবা হিন্দুর নাম, মায়ের কোলে শিশুর কোনো হিন্দু-মোছলমান নাই, মায়ের ফুঁয়ের চেয়ে বড় কোনো দোয়া নাই।

কিন্তু সেই কপিলকেই ফেলে ফুলমনি একদিন পালিয়ে যায়। নবীউল্লাকেও যখন আর তল্লাটে দেখা যায় না, লোকেরা দু'জনকে জোড়া দিয়ে কথা রচনা করে। ভাওইয়া গানের কলি মনে পড়ে যায়— নাকড্যাংটার ব্যাটাটা, মোক্ ভোলালু— তা কী দিয়ে নবীউল্লা ফুলমনিকে ভুলিয়েছে কে জানে!

নারীর মনে বাসনার বর্ষণ হইলে ভুলিবার জন্যে তো সে একপায়ে খাড়া! এই কথা লোকের মুখে মুখে কিছুকাল ফেরে। তারপর সে-কথাটিও বিস্মৃতির কলসি গলায় বেঁধে নদীর নাম আধকোশা সেই আধকোশার অগাধ জলে তলিয়ে যায়।

ফুলমনি আবার নিকা করে কি করে না, পরিষ্কার বৃত্তান্ত নাই। লোকেরও আর মাথাব্যাথা নাই। পরে যখন কপিল হয় বিখ্যাত, জলেশ্বরীতে মুখে মুখে তার নাম, বাজারেঘাটে তাকে নিয়ে আলাপ, তখন তার মা ফুলমনিরও কথা ওঠে। যে-জননী আর নাই, যে-জননী কবেই নিরুদ্দেশ, জনরবের ভেতরে সে আবার ফিরে আসে। এও এক আশ্চর্য কথা— কপিলের বাপের নাম কেউ করে না, বাপের নাম কারো মনে নাই, কিন্তু মায়ের কথা মায়ের নাম যে জগত ভোলে না, দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই।

আমাদের মধ্যে কেউ একজন জুৎ করে চায়ের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বলে, আল্লা যে আকাশ থেকে দুধের ধারা জ্যোৎস্নার নিশীথকালে ঝরায়, পরীর হাতে সোরাহীতে পাঠানো সেই ধারা কি কেবল ধনী ঘরের যুবতী কন্যাদের ওপর ঝরে পড়ে ? বেহেশতি সেই দুধ মাটির বিছানায় শোয়া অনাহারী নারীর ওপরেও যে অবিরল ঝরে পড়ে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ফুলমনিতে দেখা যায়। নইলে তার এত রূপযৌবন হয় কোথা হতে ? কপিলই তো বলে, জগতে এত নারী দেখিলাম হে, মোর মায়ের মতো কারো রূপ দ্যাখো নাই!

সন্তানের চোখে জননীর রূপ এক কথা, লোকের চোখে সে হয় আরেক কথা। নারীকে জননী দ্যাখে কয়জন ? জননীর পেট থেকে পড়েই তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় মানুষ। এক নারী যার গর্ভে জন্ম, বাকি সকলে তো গর্ভ-সম্ভব। তাই মানুষের অবিরাম এক সন্ধান হয় নারী। নইলে জগত যে বিরান হয়ে যাবে। শিশু আর এ জগতে না আসবে। নারীর জন্যে ক্ষুধা তাই ভাতের ক্ষুধার সমান। দুই ক্ষুধাই দুই চাকার মতো জীবনের গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। কপিল এ সংবাদ আরো পরে পাবে। কিন্তু আমাদের কাছে এ সংবাদ বহুদিন আগেই পৌঁছেছে।

আমরা যেন চোখেই দেখে উঠি ফুলমনিকে। কপিলের এখন ভাঙা বয়স, গত চেহারা, তবু তার সৌন্দর্য মরে নাই। প্রৌঢ় বয়সেও যুবকের দীপ্তি একেবারে লোপ পায় নাই। আমরা তাকে দেখে তার মা ফুলমনিকে কল্পনা করি উঠি। কোমর ভেঙে রূপ তার ঢলঢল বহে যায়। সেই ঢলে সাঁতার না দিয়ে কেউ পারে ?

আমরা কেউ ফুলমনিকে দেখি নাই। আমাদের তখন তো জন্মই হয় নাই। কিন্তু সেই আমরাই তাকে সিনেমায় যেন দেখে উঠি। সিনেমায় তো কত দেখা যায়, গরীব ঘরের যুবতী সে নায়িকা, দোরে দোরে ভিক্ষা করছে, রাস্তায় ইটের পাঁজার ওপর বসে ইট ভাঙছে, কিন্তু তার শরীর দেখে কে বলে কতকাল কিছু খায় নাই! সিনেমারই নায়িকার মতো ফুলমনিকে আমরা দেখে উঠি যখন তার বৃত্তান্ত ওঠে। তখন আরো কিছু নিষিদ্ধ কথার আন্দোলন হয় আমাদের ভেতরে। যুধিষ্ঠিরের বৌয়ের কথা আমরা ভুলি নাই।

মেথরপট্টির যুধিষ্ঠির তো আমাদের ছেলেবেলাতেই দেখা। রেললাইনের ওপারে মেথরপট্টি। রোজ ভোরে যুধিষ্ঠিরকে দেখতাম কেরোসিনের টিন ঘাড়ে বেরিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় পায়খানার পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছে সে। আমরা কেউ যদি তখন পায়খানায় বসা, তেজ করে হাঁক দিচ্ছে— হো হো হামি আসিয়াছে! তক্ষুনি আমরা ঝটঝট জলশৌচ করে লাফিয়ে বেরুচ্ছি দরোজা ঠেলে। যুধিষ্ঠির আমাদের পায়খানার গামলা তার টিনে ঢেলে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে পাশের বাড়িতে। দুর্গন্ধ বলে কিছু জানা নাই তার। হাটবারে যেন গুড়ের মটকি কাঁধে করে রাস্তা ভাঙছে ব্যাপারী। মাছি ভনভন করছে গুয়ে নয়, আখের গুড়ে যেন!

সে গন্ধ পড়ে থাক, গা গুলিয়ে আসত আমাদের আরেক গন্ধে। একেকদিন মেথরপট্টি থেকে চামড়া আর মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ভেসে আসত। শুয়োর পোড়ানো হচ্ছে। শুয়োরকে নাকি পেট পুরে কাঁচা চাল খাইয়ে, তারপর গলায় তার লোহার শিক ঢুকিয়ে হত্যা করে, আগুনে পোড়াত ওরা। তারপর সেই পোড়া শুয়োরের পেট থেকে আগুনসেদ্ধ ভাত বের করে তার মাংস কেটে কেটে খেত। মদ খেয়ে হল্লা জুড়ে দিত গভীর রাত পর্যন্ত।

ইউনিয়ন বোর্ডের বড়কর্তা বড়খোকাবাবুর কাছ থেকে মাস মাইনেটা পাবার পর মাসের মধ্যে সে ছিল এক মহাভোজন ওদের। পরদিন পর্যন্ত পা টলমলে। পরদিনও গলায় তাদের হল্লাবাজির রেশ। তারপর আবার সেই অনাহার, দিনের পর দিন। আবার সেই দোরে দোরে হামলে পড়া— বাবু, একঠো চৌআন্নি দেও না, বাবু! বড়া ভুখ! মরিয়া যাবো! মরিয়া গেলে কে তোদের ময়লা ঠেলবে!

সেই যুধিষ্ঠিরের বৌ! মনে আছে আমাদের, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বেশি করেই মনে আছে। আমাদের তখন বালক বয়স, কিন্তু তাতে এ বোধ-বিষয়ের কোনো বিরোধ নাই— যুধিষ্ঠিরের বৌয়ের রূপ দেখে তখনি আমাদের চোখ ঝলসে যেত। মেমসাহেব তার কাছে কী লাগে! টকটক করছে ফরসা গোলাপি রঙ, উঁচু বুকজোড়া টসটস করছে যেন ফেটে বেরুবে। ময়লা গোলাপি শাড়িটা পরেছে, দ্যাখো না চেয়ে, কোমর-নাভি দেখা যাচ্ছে। কালো এক ফোঁটা তিল বসানো চিবুকটা তুলে ধরে পথ হাঁটছে, যেন বড় দারোগার বৌ সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন তাজমহল টকিজে।

যুধিষ্ঠিরের সেই বৌয়ের কথা কানে আসত আমাদের। ডাক পড়ত তার থানায়। থানার পেছনে হাজতঘর। তাকে কি অ্যারেস্ট করে আনা হতো ? আরে, না, না। সেই কাজ হচ্ছে! থানার বড় দারোগা নতুন বদলি হয়ে এসেছেন, বৌ আনেন নি এখনো, বৌয়ের কাজ করছে যুধিষ্ঠিরের বৌ। ডাকবাংলায় উঠেছেন ঢাকা থেকে আসা ইন্সপেক্টর। সরকারি কাজ কেমন চলছে তার তিনি হিসেব নেবেন। কাছারিতে তোলপাড়। ট্রেজারিতে সাজসাজ। কিন্তু সে সব দিনের বেলা। রাত হলেই যুধিষ্ঠিরের বৌকে নিয়ে হনহনিয়ে পথ ভাঙছে ও কে ? আর কে ? ডাকবাংলারই সমশের চৌকিদার। তারপর ? তারপর আর কী! ভোরবেলায় দেখা যাবে যুধিষ্ঠিরের বৌ টলতে টলতে মেথরপট্টির দিকে যাত্রা করছে।

এও এক ক্ষুধা। মানুষের এও এক মঙ্গার ভেতরেই বিচরণ। মানুষের শরীর তো এভাবেই জর্জরিত হয়ে ওঠে ক্ষুধা পেলে। অনাহারী কচুঘেচুর সন্ধান করে, সেই কচুঘেচুই সে গোশতো-পোলাও বোধে খায়। জন্মযন্ত্র ক্ষুধিত হলে টনটন করে ওঠে নাড়ি। তখন মেথরপট্টি বলে বোধ থাকে না। যুধিষ্ঠিরের বৌয়ের গতরে শুয়োর পোড়া গন্ধটাও আতর হয়ে ওঠে। তার দাঁতের ফাঁকে শুয়োরের মাংসের কুচিটাও তখন বেদানার দানার মতো মিষ্টি বোধে খুঁটে খুঁটে খাওয়া যায়।

কী কথায় কোন কথা! ফুলমনির কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের বৌয়ের কথা ওঠে কেন ? কপিলের বাপ নিরুদ্দেশ হবার পর শোনা যায়, ফুলমনিরও ডাক পড়তে থাকে থানার পেছনে হাজতঘরের বারান্দায়, ডাকবাংলার কাঠের উঁচুথামের ওপরে টঙ ঘরে। কিন্তু ফুলমনি সেই জাতের মানুষ যারা আকাশকে ভয় করে। আমাদের কাছে আকাশ, সে-আকাশে মেঘ আসে, রোদ ফোটে, চাঁদ ওঠে, পাখি ওড়ে। ফুলমনির কাছে আকাশ নয়, আকাশের ওপারে আছে আরো এক আকাশ, নিরিখ না করা যায়, তার নাম আসমান। সেই আসমানে থাকে একজন। সেই একজনের নাম উপরওয়ালা।

উপরওয়ালাকে ফুলমনি চোখে দ্যাখে নাই, তবে তার আচরণ সে দেখেছে। উপরওয়ালা আসমানে এত তারা ফোটায়, চাঁদটাকে ফালি করে কাটতে কাটতে আবার একদিন চিকন ফালির পরে ফালি জোড়া দিয়ে পূর্ণিমায় গোল করে তোলে, বৃষ্টির এত ধারা বর্ষণ করে উপরওয়ালা, মাটিতে এক দানা গরম ভাত কিন্তু কখনো উপুড় করে ঢালে নাই। যদিওবা ঢেলে থাকে, ফুলমনির হাতে পড়ে নাই। তবু সেই উপরওয়ালাকে ভয় করা ছাড়া শিক্ষা তার হয় নাই। ভয় সে কী ভয়, জন্মজন্মান্তরের ভয়। কী যে ভয় দেখায়! ওই পথে চলিও না, দোজখের আগুনে পুড়িবে। ওই কাম করিও না, আজাবের সাপ দংশিবে।

কিন্তু ভাতের ক্ষুধা বড় ক্ষুধা। একবার লোভ হয়, আরবার মনে হয়— অনাহারে মরণ তবু শান্তির, একবারে চিরতরে ঘুচে যায় ক্ষুধা। কিন্তু সেই উপরওয়ালার সাপের দংশনে মরণ তো হবে না, অনন্তকাল তার ছোবল খাওয়া। একবার কপিলের মাথার কাছে ফণা ধরে উঠেছিল গোক্ষুর সাপ। গভীর নিশীথে মাটির ওপরে পাশে শোয়া ছিল মা আর ব্যাটা। হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দে জেগে ওঠা। আর কিছু মনে নাই ফুলমনির। কপিলের মনে আছে। কপিলের নিজচোখে দেখা নাই। মায়ের কাছে বৃত্তান্ত এসব শোনা।

কী করি রাইতটা যে গ্যাছে মোর বাপ! সাপটা যে কী বলিয়া দংশায় নাই, ফণা ধরি সর্‌সর্‌ সর্‌সর্‌ করি ফিরি গেইছে খানিক পরে। বিহানের আলোক পড়িতেই দেখি নিন্দে তোর মুখখান কুঞ্জবাবুর মন্দিরে ঠাকুরের মতন রোশনাই হয়া আছে।

নবীউল্লার কথায় এবার এসে পড়েছি। লোকটা ফুলমনির কাছেপিঠেই কোথাও থাকত। ঘর তোলার কামলার কাজ করত। বেড়া বাঁধত, ঘরের চালা তুলত। হাতে তার ধারালো দা'খানা চকচক ঝকঝক করত। হাটে বাজারে পাড়ায় পাড়ায় কাজ খুঁজে বেড়াতো দা হাতে। আচমকা সেই দা দেখে কারো যদি প্রাণ কেঁপে ওঠে, ওই দা'য়ের জন্যেই ফুলমনি পেত সাহস।

না, বইন, ডর করিও না। কাঁইও যদি নজর দেয়, তার কল্লা একো কোপে!

নবীউল্লা মাঝে মাঝে চাল এনে ফুলমনির কোঁচড়ে ঢেলে দিত ঝরঝর করে। বাজার থেকে পটল ঝিঙ্গা কুড়িয়ে এনে বলত, নেও,

মরিচও আছে গোটাকয়, ভত্তা করি ভাত খাইও।

ফুলমনি আবদার ধরে, বেড়া বান্ধনের কাম মোকে শিখেয়া দেন না কেনে? তোমার সাথে সাথে কাম করিতে গেনু হয়!

আউ আউ বলে ওঠে নবীউল্লা। আউ আউ, বেটিছাওয়ার কাম এগুলা নয়।

তবে কোনো ভাল্ বাড়িতে দাসীর কাম খোঁজ করি দ্যাখেন না, ভাই।

আবার আউ আউ করে ওঠে নবীউল্লা। বলে, পাগলি! দুনিয়ার রকম তোর জানা নাই। দুনিয়ায় ভাল্ বাড়ি বলি কোনো বাড়ি নাই। যে বাড়িতেই দেমো তোকে, পাঁচো ওয়াক্তের নামাজে আজান হইবে, ওজুর পানির শব্দে দিকদিশা খলবল করি ছাড়িবে, তারপর তারাই তোকে খুবলি খুবলি খাইবে রাইতের বেলা।

সে-কথা শুনে শিউরে ওঠে ফুলমনি। খুবলে খাওয়ার সম্ভাবনা সে তো দেখেই আসছে। কপিলের বাপ যাবার পর থেকেই ডাকবাংলার সমশের চৌকিদার নিত্য তার কাছে আসা যাওয়া করছে।

ফস ফস করে বিড়ি টানে আর হাতের ঝাড়া দিয়ে ফুলমনিকে তাড়া দেয়, রাখ্ তোর অংচং। আর বেদিশা না করিস।

আচ্ছা, মুঁই ভাবি দেখি, বলে ফুলমনি সেদিনের মতো লোকটার হাত থেকে রেহাই পায়। ভয় করে, কোনদিন না লোক নিয়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। ভয়ে বুক থরথর করে ফুলমনির। উপরওয়ালার সাপ এসে বুকে ছোবল দেবার জন্যে ফণা দোলাতে থাকে।

তারপর, রাতের বেলা ব্যাটার মাথার কাছে সত্যি সত্যি সেই গোক্ষুর সাপ। নবীউল্লাকে ফুলমনি সেই সাপের কথা বলতেই লোকটা বলে ওঠে, উপরওয়ালা তোকে সাবধান করিতে সাপের ছবি দেখাইছে রে। সাপ নয়, উপরওয়ালাই সাপের ছুরত ধরি তোর কাছে আসিছে। সাবধান! যদি ডাকবাংলার ডাক শুনিস কি, ভাতের সানকি ভরিবে বলি থানার ঘরে যাইস!

তবে উপায়?

উপায় সেই উপরওয়ালাই করিবে। কতদিন ধরি তোকে বুঝাই, একজনের বরাতে বরাত নয়, দুইজনের বরাতে বরাত হয়। একজন যদি ভাতের অভাবে কান্দে, দুইজনে একোসাথে হাত পাতিলে ভাত হবারও পারে।

দুইজন? একসাথে? নতুন একটা চোখে নবীউল্লার দিকে তাকায় ফুলমনি।

নবীউল্লা বলে চলে, হামারও তো বেড়া বান্ধিয়া দিন আর চলে না রে, ফুলমনি। বত্তমানে টিনের ঘরের দিন পড়িছে। সব লোহা ইস্কুরুপের কাম। করাত বাটালির কাম। দাও আর গুনার কাম বত্তমানে বিরল হয়া পড়িছে। পেটের ভুখ বলিয়া কথা। তুই আর মুঁই, চল্, চলি যাই। কাউনিয়া যামো, অম্পুরে যামো, পার্বতীপুর যামো।

গত সন্ধ্যাবেলা ডাকবাংলার সমশের চৌকিদার এসেছিল। কত তার হাতেপায়ে ধরেই না বিদায় করেছিল ফুলমনি তাকে।

না, বাপো মোর। তোমরা না মোর বাপ হন, এই অকথা কুকথা না কন।

ভাত দিবে!

ভাতের ভুক সইজ্জো করি অব্যাস আছে, কাকা।

পাইসা দিবে!

পাইসার টুন্‌টান্ শুনিয়া মোর পেট ভরিবে?

পিন্দনের শাড়ি দিবে!

জননীর শাড়ি ছিঁড়ি ফাত্‌রা ফাত্‌রা হইলেও গতর তার উদাম হয় না, কাকা হে।

কিন্তু সেই জননীই পরদিন নবীউল্লার হাত ধরে জলেশ্বরীর পাশেই যে গ্রাম সেই বুড়িরচর থেকে উধাও হয়ে যায়। কথক ঠাকুরের কথা শুনে বুকের মধ্যে যে শোক হতো, মুনির ঘরে সন্তানের জন্ম দিয়ে অপ্সরীরা যে একদিন মাটির পৃথিবীতে সন্তান ফেলে উড়ে চলে যায়, আমাদের সেই শোক তবে কিছু না? স্বর্গের মানুষ করতে পারে, মাটির মানুষ আমরা তা করলেই তুমি ছিটকে পড়বে কেন?

দুই

সকালের ট্রেন ফিরে গেছে জলেশ্বরী থেকে। আবার ট্রেন আসবে সন্ধ্যাবেলা। মাঝখানে সাত-আট ঘণ্টা ট্রেন চলাচল নাই। ঘুমটিওয়ালার বাড়িঘর এই ঘুমটিতেই। ভাত রেঁধেছিল ঘুমটিঘরের পাশেই খোলা আকাশের নিচে মাটির খোলা উনোনে। পাটশাকের চচ্চড়ি করে নিয়েছিল শুকনো খোলায়। ডালও একমুঠি রান্না করেছিল। চেঁচেপুঁচে খেয়ে এখন ঘুম।

হাটের ব্যাপারীদের গো-গাড়ি আসে দূরদূরান্ত থেকে। ঘুমটিঘরের কাছে এসে রেললাইনের ওপর কোনো কোনো গো-গাড়ি টালবেটাল হয়ে পড়ে রেলের পাটিতে। তখন গাড়ি ঠেলতে হয়। ঘুমটিওয়ালাকে হাত লাগাতে হয়। আর তার দরুণ ব্যাপারীরা কখনো তাকে একমুঠি আলু কি এক ভান্ড ডাল কি এক দোনা চাল দিয়ে যায়। মঙ্গার দেশে খাদ্যের চেয়ে বড় পুরস্কার কিছু নাই।

পুরস্কারের কথা যদি উঠল তবে ঘুমটিওয়ালার মুখ ছুটল। এমনিতে সে সারাদিন চুপচাপ পড়ে থাকে, কেউ এসে হয়তো তার বাঁশের বেঞ্চের ওপর দু'দণ্ড বসে জিরোয়, তাদের সঙ্গেও তার কথা হয় না। কুকুর একটা বিড়ে পাকিয়ে থাকে ডালিম গাছটার তলায়। ওপাশে বাঁশের বনে মাঝে মাঝে ওপাড়ার বৌঝিয়েরা এসে দাঁড়ায় হাতের কাজ শেষ করে। কোনো কোনোদিন তারা ঘরের একটু ভাজা চচ্চড়ি কি মাছের সালোন হাতে করে আসে আঁচলের তলায় লুকিয়ে।

আইজ ব্যাটার বাপ খলসিয়া পুঁটি গোটাকয় আনিছিলো, তেঁতুলের টক দিয়া রন্ধন করিছিনু। খায়া দ্যাখেন তো!

ঘুমটিওয়ালার সেদিন রাজভোগ হয়। গরাসে গরাসে ভাত খায়, আর দোয়া করে, আহা, বাঁচি থাকো গো! সংসার উথলিয়া উঠুক।

কিসে উথলাবে সংসার? সন্তানে? না, সন্তানের আগে ভাতের ছবি।

ভাতের গন্ধে ভরি থাকুক তোমার সংসার।

ট্রেনে তারা কখনো চড়ে নাই, বাড়ি ছেড়ে কোথাও তারা যায় নাই। সেই বৌঝিয়েরা এলে চঞ্চল হয়ে ওঠে ঘুমটিওয়ালা। আইসো হে আইসো।

বৌঝিয়েরা গল্প করে তার সঙ্গে। আজব সব গল্প। অদ্ভুত সব জিজ্ঞাসা তাদের।

হয় কি না হয়, কন দেখি! টেরেন যখন চলে, ভিতরে মানুষ নাকি দিশাহারা হয়া শক্ত করি পাটাতন চাপি ধরি বসি থাকে। নড়িলেই ছিটকি পড়িবে, হয় কি নয়?

আবার কেউ বলে, টেরেনের বাঁশি কী দিয়া গড়িছে, কন তো! আওয়াজে তার কোলের ছাওয়া তরাস করি ওঠে! এত আওয়াজ হয় কোথা হতে!

কারো বা জিজ্ঞাসা, ভকভক করি এত যে ধুঁয়া ছাড়ে টেরেনের ইনজিনখানা, য্যান জিয়াফতের চুলা জ্বলিছে, কন তো, ভিতরে কি ভাত পাক হয়? চাউলের দানা টগবগ করি ফোটে?

ভাত! ভাত ছাড়া কথা নাই। ঘুমটিওয়ালা বলে, ভাতেরে তো কারবার জগতে! এই ভাতের জন্যে এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায় যায়। ভাতের তালাশে মানুষের থির নাই।

বৌঝিয়েরা এ সংবাদ পেয়ে সর্বজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে। হাঁ, কথাখান তো ঠিক!

কারোবা তখন মুখখানা মলিন হতে দেখে ওঠে ঘুমটিওয়ালা। বৌটির স্বামী বোধহয় ভাতের সন্ধানে কোন দূর দেশে গেছে, তাই তার মুখখানা মলিন।

ঘুমটিওয়ালা ভরসা দিয়ে বলে, যে-মানুষ যায় সে-মানুষ ফিরিয়াও আসে। এইখানে বসিয়া জীবন ভরিয়া তো মানুষেরে আসা যাওয়া দেখিলোম!

এক দীর্ঘ জীবনই তার বৈকি। দেখতে দেখতে ঘুমটিওয়ালা এখন বুড়ো থুত্থুরে। বয়স তো কম হলো না, এখনো সে ঘুমটিঘর ছাড়ে নাই। কবে তার চাকরির বয়স চলে গেছে, রেলকোম্পানি তাকে অবসর দিয়েছে, কিন্তু অবসর সে নেয় নাই।

নতুন এক ছোকরা ঘুমটিওয়ালা চাকরিতে এখন বহাল হয়েছে বাংলাদেশ আমলে। সে ছোকরা মাহিনা নেবার বেলায় আছে, কাজের বেলা নাই। মাথায় তেলের পালিশ, পায়ে পাম্পশু। পরণের পিরান চকচক করে রোদের তেজে। চোখ তার ছটফট করে শালিকের মতো। ঘুমটিঘরের দিকে মন তার নাই, মন তার বাজারে ইস্টিশানে। বাজারে হাটে ফড়িয়াগিরি করে, ইস্টিশানের কড়ই গাছের নিচে মালগুদামের চত্বরে ঘোরাঘুরি করে, পাট সুপারি ধানচালের বস্তা তোলার দালালি করে। নগদ তাকে পয়সা দাও, আর ব্যাপারীর আগে তোমার চালান সে মালগাড়িতে তুলে দেবে। কোনোদিন ঘুমটিঘরে এক চক্কর দিয়ে যায়, তারপর দিনের পর দিন আর আসে না।

জংশন থেকে ইন্সপেক্টর যেদিন আসে, সেদিন বড় সজ্জা করে নিজের হাতে নিশান তুলে ঘুমটির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজার নিশানের মতো রেলের সবুজ নিশান নাড়ায়। ব্যাস ওই পর্যন্তই। বাকি দিনের ট্রেন পাস হয় এখনো এই বুড়োকে দিয়েই। নতুন ছোকরা কোনোমাসে দু'দশ টাকা দেয় বুড়োকে। বাকি দিন তার কী করে যায় কী খেয়ে থাকে সে-খবর তার রাখা নাই।

বুড়োর এখন আর বাজারে যাওয়ার শক্তি নাই। যৌবনকালে শক্তি ছিল, কিন্তু বেতনের টাকা যথেষ্ট ছিল না। এখন তো বেতন একেবারেই নাই। তবু যখন টানাটানি বেতনের সেই চাকরিটা ছিল তখন ঘরে তার বৌও ছিল।

রেলকোম্পানির চাকরি করে বলে খুব আড়ম্বর করে শ্বশুর তার মেয়েকে ঘুমটিওয়ালাকে তুলে দিয়েছিল। শ্বশুরের জানা ছিল না, বৃটিশের চাকর মানেই আলীবাবার চাকরি নয়। মাস মাহিনায় সংসার চালানো দায়। কিন্তু তারপরও ঘুমটিওয়ালার বৌ কোথা থেকে কীভাবে সামগ্রী সংগ্রহ করে রন্ধনে এত

হরেক রকম পদ সৃষ্টি করে স্বামীর জন্যে বসে থাকত, সে এক অবাক কথা। কিম্বা অবাক হওয়ার কিছু নাই। নারীর নাম তো অন্নপূর্ণা। সে কি আর সাধে সাধে!

ঘুমটিওয়ালা গল্প করে, একবার হইলো কি তবে শোনেন সেই কথা। আজকার মানুষ তো নঁও, মুঁই সেই বিটিশ আমলের।

তার গল্পটা হচ্ছে, বছরের পর বছর এ গল্প সে বলে এসেছে, শীত নাই গ্রীষ্ম নাই এ গল্পের বিরাম নাই তার আজ এত বছর পরেও, সেবার বাংলার ছোটলাট আসবেন জলেশ্বরীতে। ট্রেনে করে আসবেন তিনি, সেকালে তখন ট্রেন ছাড়া এখানে আসার আর কোনো উপায় নাই। স্পেশাল ট্রেন। নিত্যদিনের আর সব ট্রেনের রঙ লাল, লাটসাহেবের ট্রেনের রঙ শাদা। তিন বগির ট্রেন। ইঞ্জিনের সামনে ব্রিটিশের পতাকা। সেই একবারই লাটসাহেব এসেছিলেন এ দেশে।

হুসহুস করে এসে যায় ট্রেন। ইস্টিশানে নয়, ট্রেন থামে এই ঘুমটিঘরের কাছেই। পাশেই ডাকবাংলা। কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের পাটাতন, কাঠের দেয়াল, টিনের ঢালু ছাদ, সামনে ডিমের মতো গোল বাগান, বাগানের ঢালেই পুকুর, পুকুরে পদ্মফুল। সেই ডাকবাংলায় উঠবেন লাটসাহেব। জলেশ্বরীর সাবডিভিশনাল অফিসার বড়কর্তা এসডিও সাহেব, মুনসেফ, সার্কল অফিসার, ফুড অফিসার, আর বেসরকারি বাছাবাছা ক'জন বড় মানুষের সঙ্গে তাঁর কথা হবে। তারপর ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরে যাবেন কলকাতা।

সে কী ভিড় সেদিন ডাকবাংলার রাস্তায়। লাটসাহেবকে একবার চোখে দেখবে মানুষ। ঘুমটিঘরে লাইনের দু'পাশে শেকল তুলে বসে আছে ঘুমটিওয়ালা, কেউ যেন শেকল ডিঙিয়ে ডাকবাংলার দিকে না যায় সেদিকে তার খর চোখ। কিন্তু কেবল সাহেব দেখতে মানুষ ? না, আরো আছে। দূর থেকে ঘুমটিওয়ালা দেখতে পায় মুসলিম লীগের মিছিল আসছে সবুজ পতাকা তুলে। গলায় তাদের ধমকের মতো আওয়াজ— লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, কবুল মোদের জান-পরান! কংগ্রেসওয়ালারাও কি কম যায়! তারাও আসছে আধকোশায় বান ডাকার মতো আওয়াজ তুলে— বন্দে মাতরম! সে আওয়াজে গাছের পাখিসকল চঞ্চল।

ঘুমটিওয়ালা যেন আজও চোখে দেখে ওঠে সেই ছবি। বলতে থাকে, সেই সকল সোলোগান তো তোমরা শোনেন নাই। তোমরা জয় বাংলার মানুষ। জয় বাংলা বলিয়া একদিন সংগ্রামে গেইছেন তোমরা। আর এইসকল বিটিশ আমলের কথা। তোমাদের কাছে পুরান হয়া বিস্মরণ হয়া গেইছে। তোমার বুড়া দাদা নানা যদি এলাও কাঁইও বাঁচিয়া থাকে, তবে তার কাছে বিস্তর তোমরা সেই ইতিহাস শুনি নিবেন।

বৃদ্ধদের কথা কি আমরা অনেকেই তো আমাদের কালের কত কথা বিস্মরণে দিয়ে বসে আছি। বিস্মরণই এখন বুঝি রীতি। এক সেই কাল ছিল— স্মরণই তখন ছিল জগতে উঠে দাঁড়াবার সিঁড়ি। এক এই কাল এসেছে— বিস্মরণেই এখন উন্নতি! জয় বাংলার উল্লেখ করেছে ঘুমটিওয়ালা, সেই জয় বাংলা ভুলে যাওয়াটাই এখন দেখি ওপরে ওঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

ঘুমটিওয়ালা বলে যায়, শোনেন তবে, টাউন হতে মিছিল তো এইদিকে ঘনিয়া আসিছে। ওইদিকে ডাকবাংলায় বসি সরকারি মানুষের সাথে মিটিং করিছে লাটসায়েব। দুই পক্ষের তুমুল আওয়াজে একটাও পক্ষী না আসি গাছের ডালে বসিবার পায়। মুঁই শিকল তুলি বসি আঁছো, হুকুম নাই শিকল ডিঙিয়া লাটসায়েবের কাছে কোনো মানুষ যায়। শিকল বরাবর থানার সিপাই সকল লালপাগড়ি বান্ধি বন্দুক হাতে খাড়া। তারা থাকিলে কী হইবে! মানুষ ঠেকাইতে জান তাদের যায়! মুঁইও একখান লাঠি নিয়া তাদের সাথে রোখ করিয়া খাড়া হয়া আছোঁ। তারপরে শোনেন ঘটনা কী হয়! মিছিলের মানুষ বাধা দেখিয়া তেড়িয়া হয়া উঠিলো। কয়, যাবার দেও, না দিলে কারবলা হয়া যাইবে! রাম রাবণের যুদ্ধ কাকে কয় দুনিয়া আইজ দেখিবে!

হঠাৎ একটা লাঠি এসে পড়ে ঘুমটিওয়ালার মাথায়। মুসলিম লীগের খবির মিঞা আর কংগ্রেসের রাজেনবাবু, দু'জনেই ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। ঘুমটিওয়ালার মাথা ফেটে রক্তের ধারা দেখেই তাঁরা থমকে গেলেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার যেই অগ্রসর হবার জন্যে হাঁক দিলেন তাঁরা যার-যার মিছিল দুটিকে, মানুষের বানের ঢলের মতো রেল সড়কের শেকলের ওপর ভেঙে পড়ল। কার আগে কার মিছিল যায়, তা নিয়ে বিষম ঠেলাঠেলি তখন। খবিরমিঞা বলে, হামরা আগে, হামরা আগে! রাজেনবাবু বলে, গান্ধীর আগে জিন্না নয়, গান্ধীর দলই আগে যাইবে।

দুই মিছিলের মধ্যে তখন হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। লাটসাহেবের ট্রেনের ইঞ্জিন হুইসিল দিয়ে ওঠে গগন চিরে। গাছের ডালে ডালে কাকপক্ষীর চিৎকার শুরু হয়ে যায়। কাকপক্ষীর এমন চিৎকার এই সেদিনই জলেশ্বরীর মানুষ শুনেছে। দুর্গাপূজার বিসর্জনের দিনে দেবী নিয়ে নদীর দিকে যাবার কালে কাছারির মসজিদ পড়ে পথে, সেই মসজিদের সামনে বিসর্জনের ঢোল শুনে মুসলমান যুবকেরা রোখ করে ওঠে। বিসর্জনের মিছিলের ওপর তারা চড়াও হয়। ধুন্দুমার কাণ্ড শুরু হয়ে যায় তখন। এমন কাণ্ড জলেশ্বরী আগে কখনো দেখে নাই। মানুষ কী দেখবে, কাকপক্ষীও দেখে নাই। মানুষের গরম আওয়াজে, পক্ষীসকলের চিৎকারে, পুলিশের লাল পাগড়িতে সয়লাব হয়ে যায় আকাশ বাতাস। দেবী পড়ে থাকে গো-গাড়ির মাচানের ওপর! কে বা কাকে তখন বিসর্জন দেয়! সুখেদুঃখে একসাথে থাকা মানুষেরই সুবোধ বুদ্ধির বিসর্জন হয়ে যায় সেদিন।

কিছুক্ষণ হাতাহাতি দৌড়াদৌড়ি হবার পর খবিরমিঞা আর রাজেনবাবু সরোষে দু'জনে মুখোমুখি হন। দু'জনেরই তখন মাথায় খুন। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের সাক্ষাৎ দুই প্রতিমূর্তি।

ইনি বলেন, হামরা আগে যামো।

উনি বলেন, না! হামরা আগে!

তখন ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন টিপ্পনি কাটে, মাথায় পানি দিয়া শান্ত হন দুইজন! নিকটেই টিপকল আছে।

মিছিলের সকল মানুষই তবে একরোখা নয়! কারো কারো তবে হিত-অহিত জ্ঞান এরপরও থাকে। হিতের কথা এমন কথা, একবার কেউ বললে ধীরে ধীরে আরো অনেকে সায় দিয়ে মাথা দোলাতে শুরু করে। প্রথমে আলতো একটা বাতাস ওঠে, তারপর সব গাছেরই ডাল নড়ে।

এবার একজন বলে, তোমরা তো বড় মানুষ গান্ধী জিন্না নিয়া তপ্ত হয়া আছেন, এইদিকে যে একজনের মাথা ফাটি রক্ত পড়ে, তাঁই তো এই কাজিয়ার মইধ্যে নাই। আগে তাকে বাঁচান। নিরীহ নির্দোষ মানুষটা যে মরে!

ব্যাপার দেখে ডাকবাংলা থেকে ছুটে এসেছিলেন মহকুমার এসডিও সাহেব। ঘুমটিওয়ালার এখনো মনে আছে বাঘের মতো এতবড় মুখখানা তাঁর। ভাঁটার মতো চোখ। কোটপ্যান্ট নীল রঙের। সেকালের মুসলমান, মাথায় তাই ফেজ টুপি। টুপির রঙ ঘন লাল, ঝালরটা তার কালো। টুপির সেই কালো চিকন লেজের ঝালর একপাশে ঝলঝল করে। ছুটে আসার তোড়ে এখন ঝালরখানা ডানে বাঁয়ে ঝাপট দিতে থাকে। খবিরমিঞা নিজের জায়গাতেই সটান পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজেনবাবু ওদিকে ধুতির কোঁচা থাবায় ধরে ঘুমটির শেকল লাফ দিয়ে পার হয়ে হাকিমের সামনে খাড়া হন।

এসডিও সাহেব রুষ্টস্বরে বলেন, আপনারা শুরু করেছেন কী! দিল্লিতে নতুন বড়লাট এসেছেন ভারতবাসীর দাবিদাওয়া শুনতে। সব

ফয়সালা সেখানে হবে। এখানে তো কিছু না! এখানে বাংলার ছোটলাট এসেছেন মঙ্গার খোঁজখবর নিতে। চুয়াল্লিশধারা জারী করা হয়েছে, গতকাল ঢ্যাঁঢড়া পিটে জানানো হয়েছে। নেতা হয়েছেন, আইন বোঝেন না? প্রসেশন নিয়ে এসেছেন! গান্ধী জিন্না জহরলালও এখন আইন মেনে চলছেন, বড়লাটের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলছেন। আর আপনার? ছি ছি!

রাজেনবাবুর সঙ্গে এসডিও সাহেবের কী কথা হচ্ছে শোনার জন্যে ওদিকে চঞ্চল হয়ে পড়েন খবিরমিঞ্া। সঙ্গীসাথীদের কেউ একজন পেছন থেকে তাঁকে ঠেলা দিতে থাকে এগিয়ে যাবার জন্যে। তিলমাত্র দেরি না করে খবিরমিঞ্াও সাঁই সাঁই ছুটে এসডিও সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

এসডিও সাহেব বলে চলেন, শুনুন আপনারা, ভালো করে শুনুন, আপনাদের এখানে মঙ্গা চলছে, চালের সাপ্লাই কতটা বাড়ানো দরকার, এখানকার রিকোয়ারমেন্ট কতখানি, কতটা হলে এখানকার মানুষ খেয়ে প্রাণে বাঁচে, সরেজমিনে সেটাই বুঝে দেখতে ক্যালকাটা থেকে স্পেশাল ট্রেনে লাটসাহেব এসেছেন।

খবিরমিঞ্া রাজেনবাবু, দু'জনেই থমকে যান এসডিও সাহেবের কথা শুনে। চকিতে পরষ্পর একবার তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। এসডিও সাহেব এবার কদম বাড়িয়ে ঘুমটিঘরের শেকল বরাবর এগিয়ে যান। মিছিলের মানুষদের মুখোমুখি হন। পায়ে পায়ে রাজেনবাবুও এগিয়ে যান। খবিরমিঞ্াও পেছনে পড়ে থাকা ভালো বোঝেন না।

কখনো জনতার দিকে, কখনো রাজেনবাবু খবিরমিঞ্ার দিকে ফিরে উঁচু গলায় এসডিও সাহেব বলতে থাকেন, ভারত স্বাধীনের আলোচনা করতে লাটসাহেব আজ জলেশ্বরী আসেন নাই! ভাত! ভাতের আলোচনা করতে! পাকিস্তান হিন্দুস্থানের ফয়সালা দিল্লিতে হবে। জলেশ্বরীতে গান্ধী জিন্না কোনো বিষয় নয়। চাল! আপনাদের জন্যে চাল! ভাতের অভাবে আপনাদের মানুষ এখানে মারা যাচ্ছে! ভাতের ব্যবস্থা করতে তিনি এসেছেন।

ভিড়ের ভেতরে কেউ একজন বলে, অ্যাশনের চাউল মানে তো অ্যাশনের সেই চাউল! সে চাউল বড় গন্ধায়! রান্ধিলে গলিয়া যায়। মুখে না দেওয়া যায়।

এসডিও সাহেব জানেন কোন চালের কথা বলা হচ্ছে। সেই চাল, যে-চাল এই সেদিন শেষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানিদের ভয়ে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়, জাপানিরা বার্মা থেকে আসাম ঠেলে বাংলায় এসে পড়লে তারা খাদ্যখাবার যেন না পায়। সেই চাল রেশনে দেয়া হচ্ছিল মাথাপিছু সপ্তাহে এক সের। ভালো চাল এক সেরেই সপ্তাহ চলে না, মাটিতে পোঁতা পোকাধরা নোনাধরা চাল ঝেড়ে বেছে রান্না করলে একদিনেরও খোরাক নয়।

মাথার টুপি খুলে এসডিও সাহেব চাঁদির ঘাম হাতের চেটোয় মুছে নিয়ে আবার পরেন। দু'হাত তুলে বলেন, না, না, সে চাল নয়, ভালো চালের সাপ্লাইয়ের কথা লাটসাহেবকে আমিই বলতে শুরু করেছিলাম, এর মধ্যে আপনারা এক হাঙ্গামা বাধিয়ে বসলেন!

মিছিলের কানে এসডিও সাহেবের কথাগুলো যায়। মিছিল নরোম হয়ে পড়ে। ভালো চালের কথা শুনে ভিড়ের ভেতরে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। সেই গুঞ্জন ক্রমে উচ্চরব হয়ে পড়ে।

ভাত! ভাত! আগে ভাতের জোগাড়, তারপরে পাকিস্তান! আগে চাউলের বন্দোবস্ত, তারপরে হিন্দুস্থান!

হাকিমের চোখ এতক্ষণ চঞ্চল ছিল, চোখের তারা পাখির মতো ঝাপট মারছিল যে মিছিলের রোখ বা কোন্‌দিকে যায়। পাকিস্তান হিন্দুস্থান নয়, ভাতের দাবি উঠতে দেখে তাঁর চোখ এতক্ষণে স্থিতি পায়, চোখের তারায় উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। তিনি বলেন, রাজেনবাবু আসুন, খবিরসাহেব আসুন, আমি আপনাদের দেখা করিয়ে দিচ্ছি লাটসাহেবের সঙ্গে। নিজেদের ঝগড়া ভুলে একযোগে দু'জনেই যদি এখানকার চালের চাহিদা পরিমাণটা লাটসাহেবের কাছে পেশ করতে পারেন, তাহলে মানুষ বাঁচে।

তার আগে হামাকে কাঁই বাঁচায়! এত দীর্ঘ বছর পরেও মাথায় যেন এইমাত্র লাঠি পড়েছে, আর্ত গলায় ঘুমটিওয়ালা বলে ওঠে, হামার যে জেবন যায়! সে আমাদের গল্প বলে চলে, মুঁই যে পড়িয়া আঁছো মাথা ফাটিয়া, মানুষ কারো তো লক্ষ নাই হামার দিকে। লক্ষ ছিলো এসডিওর। ভিড় ঠেলিয়া তাঁই হামার বগলে আসি খাড়া হয়া খানিক নজর করি দেখিলেন। তারবাদে থানার পুলিশকে হুকুম দিলেন, ইয়াকে সুস্থ করি তোলো। বলিয়াই এসডিও ফিরি গেইলো ডাকবাংলায়। পুলিশ হামাকে জলপট্টি করি বেঞ্চির উপরে বসেয়া দিলো।

সেই বেঞ্চি এখন আর নাই। লোহার ছিল সে বেঞ্চ। জলেশ্বরী ইস্টিশানেও তেমন লোহার তিনটা বেঞ্চ ছিল প্ল্যাটফরমের ওপর গজাল দিয়ে শক্ত করে বসানো। লোকেরা কবেই সব খুলে নিয়ে গেছে। আমরা সেই বেঞ্চগুলোর শুধু পায়ের লোহার ভিতটাই দেখেছি। আজও আছে মরচে পড়া। সেখানে আর বেঞ্চ নতুন পাতা হয় নাই। ঘুমটিঘরের আঙিনায় লোহার পায়াটা পর্যন্ত উধাও কবে। আমরা এখন সেখানে বাঁশের বাতা দিয়ে কোনোমতে গড়া বেঞ্চির ওপর বসে লোকটার গল্প শুনছি।

কতখন বাদে খবিরমিঞ্া রাজেনবাবু লাটসায়েবের সাথে মোলাকাৎ করিয়া ফিরিলো। তারবাদে এক আচ্চয্য ঘটনা। থানার বড় দারোগা আসিয়া হামাকে কয়, লাটসায়েব তোকে বোলাইছে। শুনিয়া তো মোর আরেক দফা জ্ঞানহারা হবার জোগাড়! একবার লাঠির আঘাত পায়া, এইবার লাটসায়েব বোলায় শুনিয়া! কেনে বোলায়? কী কারণ? মিছিলের মুখে শিকল তুলি দেওয়া কি তবে হামার অপরাধ ছিলো, তাই বোলায়? পায়ের উপরে আর খাড়া হবার শক্তি পাঁও না। দারোগা হামাকে হিড়হিড় করি টানি নিয়া যায়।

কোথায়?

আর কোন্‌ঠায়? ডাকবাংলায়! টানিতে টানিতে ডাকবাংলার পাটাতনের উপরে নিয়া দারোগা হামাকে খাড়া করি দেয়। লাটসায়েবও খাড়া হয়া আছে। চোখ মেলি দেখি লাল টকাটকা মুখখান, মাথায় বারান্দালা শাদা টুপি, টুপির ফিতা তাঁর গলার গোশতের উপর টাইট। হাতে একখান চকচকা চিকন ছড়ি। ছড়ির নাল চান্দি দিয়া বান্ধান। হামাক বুঝি ছড়ি দিয়াই সপাং করি মারে!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমটিওয়ালা হাতজোড় করে। কিন্তু গলায় তার স্বর ফোটে না। ঠোঁটজোড়া কাঁপে বাচ্চা শালিকের ডানার মতো। আমরা ছবি দেখে উঠি।

লাটসাহেব হাকিমের দিকে ফিরে বলেন, ইজ দিস দা ম্যান?

ইয়েস, মাই লর্ড।

ঘুমটিওয়ালাকে নীল চোখে খানিক নিরিখ করে লাটসাহেব তাকে বলেন, ডরো মাৎ। হাম খবর পায়া ওয়াস্তে তুমকো বোলায়া। আভি আরাম হ্যায় তো?

সাহেবের মুখে হিন্দি শুনবে ঘুমটিওয়্যালা স্বপ্নেও ভাবে নাই। জলেশ্বরীতে তখন বিহার কাটিহারের অনেক পশ্চিমা ছিল, এখন তারা নাই, পার্টিশনের পরে একে একে সবাই মুলুকে ফিরে যায়। ব্রিটিশ আমলে ইস্টিশানের কুলি কয়েকজন আর সিগনালম্যান ছিল। আর ছিল ভাজাওয়ালারা, ভাজা বুট বাদাম চানাচুর বানিয়ে ফেরি করত। ছিল ধোবারা। আর মেথরেরা। সবাই পশ্চিমা। ঘুমটিওয়ালার কাছে তাই হিন্দি খুব অচেনা ভাষা ছিল না। জন্মের অবাক সে হয়েছিল ইংরেজ সাহেবের মুখে হিন্দি শুনে।

কেয়া, চোট বহোত লাগা ?

না, হুজুর।

আরাম হ্যায় ?

হাঁ, হুজুর। খুব আরাম। বেদনা বিষ সব চলি গেইছে, আপনার যে সাক্ষাত পানু এতেই মুঁই ভাল্ হয়া গেইছোঁ।

হোয়াট দিস ম্যান ইজ সেইং ?

এসডিও সাহেব বিস্তর করে তৎক্ষণাৎ বলেন, হি ইজ গ্রেটফুল, স্যার। গ্রেটফুল দ্যাট হি গট্ ইয়োর লর্ডশিপস্ অ্যাটেনশন। হিজ ইনজুরি ইজ নট মাচ্। জাস্ট আ সুপারফেসিয়াল কাট। হি হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অব। সিভিল সার্জন ইউল হ্যাভ আ লুক অ্যাট হিম লেটার। হি উইল বি অলরাইট। উইথ ইয়োর পারমিশন, মাই লর্ড, মে আই ডিসমিস হিম ?

এসডিও সাহেব ঘুমটিওয়ালাকে বিদায় দেবার জন্যে হাত তুলেই ফেলেছিলেন, লাটসাহেব হাতের ছড়ি তুলে বাধা দিলেন।

নো, নো। নট ইয়েট!

লাটসাহেবের নাম লর্ড কেসি। বিলেতের লর্ড ঘরানার সন্তান। তদুপরি বাংলার গভর্নর। সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইন্ডিয়ায়। ইন্ডিয়া ছেড়ে ইংরেজের যাবার সময়টাও খুব দূরে নয় আর। হতাশা ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। তবু যতক্ষণ তারা আছে, মাথাটা উঁচু রাখাটা চাই। ইন্ডিয়ার মানুষজনের কাছে জানমালের মালিকের মতো আচরণটা বজায় রাখা চাই।

লর্ড কেসি এসডিও সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, ইজ হি দা অনলি ক্যাজুয়ালিটি, হোয়াট ?

ইয়েস, মাই লর্ড। অনলি ওয়ান, জাস্ট হিম।

অ্যান্ড হি ওয়াজ অন ডিউটি ?

গার্ডিং দা রেলক্রসিং, স্যার।

আই সি!

আ গুড ওবেডিয়েন্ট ফেলো, স্যার। আ গুড অ্যান্ড লয়াল সার্ভেন্ট অব দা বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে।

অ্যান্ড ডিউটিফুল! এ কথা বলে লর্ড কেসি ঘুমটিওয়ালার দিকে ফিরে বলেন, তুম চোট পায়া, হামারা দুখ হুয়া। সরকারি হুকুম তুমনে মানা, জান কা পরোয়া নেহি কিয়া। হাম খুশ হ্যায়। তুমকো বাকশিস মিলনা চাহিয়ে। হাম তুমকো কুছ বাকশিস করনা মাংতা। তারপর এসডিও সাহেবকে বলেন, আই রিয়ালি ডু নট নো হোয়াট টু বাকশিস হিম। বাট হি ডিজার্ভস সামথিং, ডাজ হি নট ?

ঘুমটিওয়ালা ফ্যালফ্যাল করে লাটসাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। বকশিস ? বকশিস সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কিসের বকশিস ? সাহেবের সে এমন কোন উপকার করেছে যে তিনি তাকে বকশিস দিতে চাইছেন ?

এসডিও সাহেব তাড়া দিয়ে বলেন, তাকিয়ে আছ কেন ? বুঝতে পার নি ? লাটসায়েব খুশি হয়ে তোমাকে কিছু দিতে চাইছেন। বলো, নির্ভয়ে বলো, কী চাও ? তারপর তিনি লর্ড কেসির দিকে ফিরে বলেন, আই এক্সপ্লেইনড্ টু হিম ইয়োর উইশ, মাই লর্ড।

ওই লর্ড মাই লর্ড সম্বোধন খুব ভালো লাগছে না লর্ড কেসির। ডাকটা বর্তমানকালে তাঁর যথাযথও মনে হয় না ইন্ডিয়ানদের মুখে। কেমন ফাঁকা শোনায়। বিরসকণ্ঠে তিনি এসডিও সাহেবকে বলেন, আস্ক হিম হোয়াট হি ওয়ান্টস। আস্ক হিম হোয়াট উড মেক হিম হ্যাপি।

লর্ড কেসির পাশে তাঁর ইংরেজ সেক্রেটারি, কলকাতা থেকে আসা উচ্চপদস্থ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা, মহকুমার এসডিও সাহেব, স্থানীয় অনেক বিশিষ্টজন। সবাই তাকিয়ে আছেন ঘুমটিওয়ালার দিকে। কিন্তু লোকটার মুখে কথা নাই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

জলেশ্বরীর সরকারি উকিল আশুবাবু ছিলেন পেছনেই দাঁড়িয়ে। ভিড় ঠেলে তিনি মাথা বাড়ান, বাঘের নখের মতো তাঁর গোঁফজোড়ার ভেতর থেকে আওয়াজ করে ওঠেন, এইও! রামছাগল! বলে ফ্যাল! লাটসাহেব জিগ্যেস করছেন, কী পেলে তুই খুশি হবি। টাইম খারাপ করিস না। বলে ফ্যাল!

আশুবাবুর তাড়া খেয়ে ঘুমটিওয়ালার ঠোঁট নড়ে ওঠে, মুখ থেকে একটিমাত্র শব্দ অস্ফুট গড়িয়ে পড়ে, ভাত!

হোয়াট ? হোয়াট ডিড হি সে ? লর্ড কেসি আশুবাবুর কাছে জানতে চান।

রাইস, স্যার! অনলি রাইস!

স্বয়ং লাটবাহাদুর তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি উত্তর দিয়েছেন, এত বড় সৌভাগ্য আশুবাবু রাখেন কোথায়! গর্জন করে ওঠেন ঘুমটিওয়ালার দিকে ফিরে, ভাত! তোর বাপের ভাগ্য লাটসায়েব জানতে চেয়েছেন কী চাস্! জমি চা, টাকা চা, তা নয় ভাত! মাসে মাসে বেতন পাস, সে টাকায় ভাত হয় না তোর! এতবড় কথা তুই লাটসায়েবের কানে দিলি, হারামজাদা ?

গালিটা আলটপকা মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই আশুবাবু জিভ কাটেন। লাটসাহেব বাংলা না জানলেও হিন্দিটা জানেন, আর ওই বাংলা কথার মধ্যে হারামজাদা শব্দটা লাটসাহেব ঠিকই বুঝে ফেলবেন। যেখানে ভদ্র বিশিষ্ট লোকেরাই কাছে আসতে পায় না, সেখানে লাটসাহেব নিজে লোকটাকে ডেকে এনেছেন, আর সেই লোকটিকেই কিনা হারামজাদা বলা! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যান আশুবাবু। ব্যাপার বেগতিক হয়ে যাবার আগেই হাত কচলাতে কচলাতে স্খলিত হেসে লাটসাহেবকে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টায় তিনি বলেন, দিজ পিপল, স্যার, দে আন্ডারস্ট্যান্ড অনলি ব্যাড ওয়ার্ড, স্যার। দে নো আন্ডারস্ট্যান্ড নো রিপ্লাই ইফ স্পিক প্রপার ল্যাংগোয়েজ, স্যার।

লর্ড কেসি আশুবাবুর দিকে ফিরেও না তাকিয়ে এসডিও সাহেবকে হুকুম দেন, ইফ হি ইজ হ্যাপি উইথ রাইস, সি দ্যাট হি গেট্‌স আ বিগ ব্যাগ অব রাইস। হুকুমটা দিয়েই তিনি আর সময় নষ্ট করেন না, গটগট করে ডাকবাংলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে অদূরেই দাঁড়ানো ট্রেনের দিকে রওনা হয়ে যান।

ঘুমটিওয়ালা খ্যালখ্যাল করে হাসতে হাসতে আমাদের বলে, লাটসায়েবের সেই ইস্পিশাল টেরেন জলেশ্বরী হতে যায় কি নাই, ঘুমটিঘরে মুঁই নিস্তেজ হয়া শুতি আছোঁ, হঠাৎ ধপাস করি আসি পড়িলো এক বস্তা। চমকি উঠি চায়া দ্যাখোঁ— চাউলের বস্তা! এ বস্তা হেথায় কেনে ? কার চাউল ? সরকারি কুলি কয়, কাছারি হতে পাঠেয়া দিলো তোমাকে। তোমরা বোলে লাটসায়েবের পাঁও ধরিয়া মাঙন করিছিলেন! হয় কি না হয় ? দ্যাড়মনি বস্তা।

এ সবই ঘুমটিওয়ালার কল্পনা হতে পারে। কল্পনারও অধিক এক আছে— বেঘোর কল্পনা। যে বলে তার, যে শোনে তারও। জলেশ্বরীর হাওয়াতেই আছে বেঘোর কল্পনার কারখানা। কোন্ শত শত বছর আগে জলেশ্বরীতে আসেন বাবা কুতুবুদ্দিন, সেই তাঁকে নিয়ে কারখানার শুরু। তারও আগে কামরূপ-কামাখ্যার কথা। সে দেশে মানুষ গেলে ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয়। আরো আছে। মানুষের পেটে বাছুর জন্ম নেয়।

এমনকি এই সেদিনের কথা— লালবিবি, তেভাগা আন্দোলনের সেই নারী, জমির ধান কাটায় বাধা দিতে এলে এক পুলিশের কল্লা সে বটির কোপে নামায়। তারপর যখন গ্রেফতার হয়, পুলিশ যখন তাকে নিয়ে হরিষাল গ্রাম থেকে রওনা হয় সদর জলেশ্বরীর উদ্দেশে, পথে হঠাৎ ওঠে ঝড়। গরীবের দুঃখ মানুষ বোঝে না, বোঝে আসমান, ঝড়ের মেঘ আচমকা দেখা দেয়। পুলিশেরা তাজ্জব হয়ে দেখে ঝড়ের হাওয়ায় কোমরের দড়ি খসে যায় লালবিবির,

পুলিশের হাতে দড়ি পড়ে থাকে, লালবিবি উড়াল দিয়ে পার হয়ে যায় আসমান। এ গল্প তো আমরাই আমাদের কালে শুনে আসছি।

পেটের ক্ষুধা এমনই যে মানুষকে বেঘোর কল্পনার ভেতরে নিয়ে যায় নিশিডাকের মতো। অভাবী মানুষের উঠানে চালের বস্তা ধপ করে পড়ে। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো ঘুমটিওয়ালা আচ্ছন্ন গলায় আবারও বলে, চাউলের পরিমাণ দ্যাড় মন!

আমরা বিস্ময় গলায় প্রতিধ্বনি করে উঠি, দেড় মন!

হয় হয়। রেশনের গন্ধিয়া পচা চাউল নয়। কাটারিভোগ চাউল। মুক্তার মতন দানা। গোলাবের মতন বাস্না তার।

তবে তো তোমার মাস দুইমাস নিশ্চিন্ত!

ঘুমটিওয়ালা মাথা নাড়ে আর হাসে। হাসতেই থাকে। বলে, কিসের দুই মাস! কিসের নিশ্চিন্ত! কপালের কথা কী কমো! চক্ষের পলকে দ্যাড়মন শ্যাষ। কোথা হতে মানুষ ছুটি আসিলো। অনাহারী মানুষ। কাঙ্গাল কংকাল মানুষ। বস্তার উপর হুমড়ি খায়া পড়িলো। বস্তার চাউল ছিটকি পড়িলো। দেখিতে না দেখিতে বস্তা খালি! নিজের জইন্যে এক মুষ্টিও নাই!

হাসতে হাসতে চোখে তার পানি এসে যায়।

গল্পটাকে এগিয়ে নেবার জন্যে আমরা বলি, কন কী, বাহে! এক মুষ্টিও রাখে নাই তোমার জইন্যে ?

কিন্তু গল্পটা নিয়ে আর অগ্রসর হয় না সে, হাহাকার নিয়ে জগত অবলোকন করে বলে, বাপো হে, ইয়ার নাম চাউল। ইয়ার নাম ভাত। ভাত যার নাই, বিবেচনাও তার নাই। ভাত থাকিলেই তবে না তোমার বিবেচনা আর তবে না তোমার দয়ামায়া!

স্মরণ হয় ঘুমটিওয়ালার। এখন না হয় বিস্মরণে গেছে মহিউদ্দিন। একাত্তরের সংগ্রামে যে বন্দুক হাতে জীবন দেয় সেই মহিউদ্দিন। তার কবরও আজ বিস্মরণে গেছে। তার কাছেই ভাতের আরেক বৃত্তান্ত শোনা হয় ঘুমটিওয়ালার। তারও আগে সংগ্রামের কথা। সংগ্রাম যে কিসের আর কেমন, ঘুমটিওয়ালার সেই চৈতন্য-বৃত্তান্তের আদিকথা।

মহিউদ্দিন তো একদিন সেই ছিপছিপে বৃষ্টির রাতে টাউনের সমস্ত মানুষজনকে ডেকে তোলে। ওঠো হে, ওঠো, রংপুর থেকে মিলিটারির ট্রেন রওনা হয়ে গেছে। তারা এই এসে পড়ল বলে। এলে আর রক্ষা নাই। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। ঘরের নারী নষ্ট করবে। টাউন ছাড়ো! টাউন ছাড়ো! নদীর ওপারে চলো।

আজ ক'দিন থেকে জলেশ্বরীতে ট্রেন আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। একদিন পরে গতকাল একটা এসেছিল, ডাকবাংলার কাছেই যাত্রী নামিয়ে, পেছন দিকে ইঞ্জিন ঠেলে ফিরে গেছে সেই ট্রেন। তারপর থেকে সুনসান সব। টাউনের সড়কে সড়কে জয় বাংলার আওয়াজ হচ্ছিল যুবকদের, সে আওয়াজও আর নাই।

দায়িত্ব একটা আছে কি নাই হামার ? সেই বিটিশ আমল হতে দায়িত্ব। ট্রেন আসিবার কালে শিকল টানিয়া রাস্তা বন্ধ করো। বিটিশের লাটসাহেব হামাকে সাবাশ দিয়া গেছে। চাউলের বস্তা বকশিস করি গেইছে। তামাম টাউনে মোর সাবাশি নাম পড়ি গেইছে লাটসায়েব মোকে ডাকি নিয়া গেছে! কত মানুষ আসিয়া এক নজর দেখি গেছে হামাকে। কত খাতির করি বিড়ি খাওয়াইছে তারা। ঈদের দিনে ভোজন করাইছে ইস্টিশনের মাস্টার, শালা তো আগে মানুষ বলিয়াই গণে নাই মোকে! ইশকুলের ছাত্ররা আসি কইছে, চাচা, সাহেব দেখিয়া পাঁও কাঁপে নাই তোমার ?

না বাপো হে, পায়ের উপরে সটান হয়া খাড়া ছিনু লাটসায়েবের সামনে।

কন কী!

হয়, হয়, খাড়া য্যান লাইনের উপর সিগনাল বাতির খাম্বা! আর আইজ মহিউদ্দিন ডাক দিছে বলিয়াই পাছার কাপড় তুলিয়া দৌড় দেমো ? কিসের ডরে ?

না, ভয় কোন বস্তু জানে নাই ঘুমটিওয়ালা। ভয় যদি কোনো কিছুকে তার— সে অনাহারের। কিন্তু মানুষের তো এই এক চমৎকার— ভয়ও সহ্য হয়ে যায় তার এক সময়ে। তখন আর ভয়বোধ বলেও কিছু থাকে না।

সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। জীবন বহে চলে আধকোশা নদীটির মতো। কখনো বর্ষায় উন্মত্ত, কখনো শীতে সে শান্ত। শীতে সে আধকোশার ওপারে দূরে বহুদূরে হিমালয় দেখায় নীল মেঘের রূপ ধরে, যেন তখন মানুষের বুক থেকে পাথরের ভার নেমে যায়, চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অপরূপ সেই নীল শান্ততার ছবি দেখে। আবার, বর্ষায় সেই আধকোশা নদী হিমালয়ের বুক থেকে জলের ধারা নামিয়ে এনে পাটল খলখল কলকল করে দুরন্ত ঘুর্ণিতে দক্ষিণের দিকে বহে যেতে থাকে দু'পাড়ের বাড়িঘর ফসলের মাঠ গিলতে গিলতে। মানুষেরা এটাও দেখেছে, ওটাও দেখেছে। এত সহন যদি মানুষের না থাকত মানুষ তবে রইল কেমন করে রক্তগঙ্গার সেই একাত্তরে ?

এখন যদি তোমরা কন মিলিটারি আসি সব মারিধরি উচ্ছন্ন করিবে, তো করিবে! আবার আশ্বিন কি আসিবে না ? হিমালয় কি ছবি হয়া ফুটিবে না আসমানে ফির ?

সে ছবি ফুটতেও আমরা দেখেছি একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরে, বিজয় যেদিন আসে। সে ছবি আবার নাশ হতেও আমরা দেখেছি পচাত্তরের পনেরোই আগস্টে, বঙ্গবন্ধুর হত্যা যেদিন হয়।

ঘুমটিওয়ালা ঘুমটিঘরের ভেতরে বসে থাকে। বাইরে যেমন বৃষ্টি, মানুষেরও তেমন দাপাদাপি দৌড়ের শব্দ। সারা শহর খালি হয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। সড়কের ওপর গো-গাড়ির মিছিল, গাড়িতে বৌঝি বাচ্চা সকল। পাশে পাশে হেঁটে চলেছে যুবকেরা প্রৌঢ়রা। শব্দ নাই, ক্রন্দন নাই, গো-গাড়ির চাকায় চাকায় শুধু ক্ষীণ আর্তনাদ। মানুষের বুকে পাথরচাপা থাকে যখন আর্তনাদ, তখন বস্তুজগত প্রাণ পায়, মানুষের হয়ে কাঁদে।

প্রাচীন বৃক্ষের মতো ঘন অন্ধকার ঘুমটিঘর ভেদ করে উঠতে থাকে, সেই বৃক্ষের গায়ে ঠেস দিয়ে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে। দায়িত্ব একটা আছে কি নাই তার ? ট্রেন যদি আসে। তখন শেকল তুলে রাস্তা বন্ধ করবে কে ? শহরে একটিও মানুষ যদি নাও থাকে, গরু ছাগল তো আছে। আল্লার জীব জীবন তাদেরও।

সেই ট্রেন পরদিন দুপুরবেলা আসে। মিলিটারির ট্রেন। ডাকবাংলার কাছে এসে ট্রেন থেমে যায়। ঘুমটিওয়ালা দেখে এসেছে জানমালের মালিকদের ট্রেন সেই বৃটিশ আমল থেকে এখানেই থামে। শহরের শুরু এখান থেকে। শহরে তারা ঢোকে না। অচিন পোশাক, অচিন তাদের অস্ত্র। ডাকবাংলায় তারা আস্তানা গাড়ে।

ঘুমটিওয়ালা আমাদের বলে, খানিক পরে জুতার মসমস আওয়াজ শুনিয়া গলা আগু করি দেখি সামনে হামার মিলিটারি খাড়া। মোর বুক বরাবর বন্দুক ধরি তাঁই পুছ করে, তোমরা কে হন ?

ঘুমটির চৌকিদার।

ঘুমটি ?

হয়, হয়, ইয়াকে কয় ঘুমটি। সড়কের উপর রেললাইন চলি গেইছে। ইয়ার করোসিংকে কয় ঘুমটি।

তার বাদে তাঁই পুছ করে, তোমার জেবনের ভয় নাই ?

নাই।

আচ্চয্য কথা!

আচ্চয্য কিসে ? জেবন আল্লায় দিছে। আল্লার দানে ভয় নাই।

বন্দুক ফটাৎ করি তুলি ধরি তাঁই তখন কয়, সেই জেবন যদি তোমার অ্যালা নেই ?

জেবন নিবে আল্লা। সময় হইলে আজরাইল পাঠাইবে। তোমরা কি আজরাইল ? তোমার তো মানুষের সুরত। আজরাইল কি মানুষের সুরতে আসে ?

আরে, এ তো আচ্চয্য কথা। বন্দুক ধরিয়া আছি, মরণের ভয় নাই ?

গরীব তো মরিয়াই আঁছো। আর কী মরণ হইবে গরীবের ?

হঠাৎ সে পুছ করে, নিশান তোলো নাই ?

নিশান ?

জয় বাংলার।

না, তোঁলো নাই।

কেনে তোলেন নাই ?

যদি কন, তবে তুলি দেই।

নিশান তবে আছে তোমার, লুকেয়া রাখিছেন!

অনাহারীর ভাত জোটে না, নিশান পামো কোন্ঠে ? আনি দ্যান নিশান, গাছের মাথায় উঠিতে কতক্ষণ ? নিশান আনেন, সব্বার উপরের ডালে তুলি দেই।

মিলিটারি ফিরি যায় ডাকবাংলায়। খানিক পরে আরেক মিলিটারি আসিয়া বড় চাদরের মতো ওসাড় একখান পাকিস্তানের নিশান আনিয়া এই ঘুমটিঘরের উপর উড়াই দিয়া যায়। তার পাছে পাছে মসমস করি আরো গোটা কয় মিলিটারি আসে, এই করোসিংয়ের দুই পাড়ে বন্দুক ধরিয়া পাহারায় তারা বসি যায়।

আমরা মশকরা করে বলি, নিশান চাইছিলেন জয় বাংলার, আনি দিলো পাকিস্তানের!

দিলো! তবে নিজ হাতে উড়াই নাই, লক্ষ করেন নাই ?

নিজ হাতে যদি উড়াইতে কইতো তোমাকে ?

এ প্রশ্নের সমুখে থতমত খেয়ে নীরব থাকে সে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, কইছিলোম কি কই নাই— মানুষের সুরত ধরি আজরাইল আসে না ? কিন্তুক দুই দিন না যাইতেই চক্ষে কী দেখিলোম ? মানুষের সুরতে আজরাইলও তো আসে! আসিবার পারে! আসিয়াই গেছে। তারা কত মানুষ মারি ধরি উচ্ছন্ন করিলো, কত মানুষের জেবন নিলো, কত বাড়িঘর জ্বালেয়া দিলো, কত নারীর ইজ্জত নিলো, নারীর সেও এক মরণ, চক্ষে সব দেখিছি হে। জিয়ন্তে মরিয়া ছিলোম ঘুমটিঘরে। টেরেন কত পাস করিছি। বিটিশের আমল হতে দায়িত্ব নিয়া আছি, দায়িত্ব আইজও ছাড়ি নাই। খায়া না খায়া ঘুমটিঘরে পড়ি ছিলোম। মিলিটারির পাক করা খাসীর গন্ধে ভুরভুর করিছে ডাকবাংলার মাঠ, কোনোদিন বা মোকে তারা ভোজনে ডাকিছে, প্যাটের ক্ষুধা নিয়া মাটির পরে পড়িয়া থাকিছি হে, তবু মুঁই আজরাইলের ভোজনে যাঁও নাই।

তবে, পাকিস্তানের নিশানও তোমরা উড়াইতে অস্বীকার যাইতেন বলি মনে হয়। আর তখন তোমার জীবনখান চলি যাইতো বন্দুকের গুলিতে।

ঘুমটিওয়ালা মাথা নাড়ে আর বলে, হাঁ, বন্দুকের ভয় ছিলো, সে ভয় চলি যায় যখন মহিউদ্দিনের হাতে বন্দুক দেখিলোম।

তবে, তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?

বেঘোর কল্পনায় নিশিপাওয়া মানুষের মতো ঘুমটিওয়ালা অতীতের পথে হেঁটে যেতে যেতে যেন একবার পেছন ফিরে বলে, হাঁ, হয়।

তিন

বালকের সঙ্গে আবার দেখা হয় ঘুমটিওয়ালার। ঘুমিয়ে ছিল সে। রাতের ট্রেন আসবার এখনো অনেক দেরি। এখন তো সবে মাঝ বিকেল। এখন ডালিম গাছটির ছায়া ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। লম্বা হতে হতে রেলের পাটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ পেট ভরে ভাত খাওয়া হয়েছে ঘুমটিওয়ালার। ব্যাপারীদের কাছ থেকে কাল অনেকটা চাল পাওয়া গিয়েছিল। লবণ ছিল না। তবে, পাটের শাকে লবণ লাগে না। পাটের শাক পিছল, খানিক তিক্ত। ওই তিক্ততায় লবণহীন ডালও ভাতের ওপর পড়ে বড় স্বাদু হয়ে উঠেছিল। ক্ষুধার চেয়ে বড় ব্যঞ্জন জগতে নাই। এক থালা ভাত খেয়েছিল সে। ঘুমে ভেজা শরীর। এমন সময় কপালে তার হাত পড়ে।

বাঁশবনের ভেতরে এক কুকুর থাকে। বাঁশবনে মরা বাদুড় বিড়াল পাখি মাঝেমাঝেই পড়ে থাকে। কুকুরটা বাঁশবন আগলে থাকে। আর কোনো কুকুরকে সে বাঁশবনের ধারেকাছে আসতে দেয় না। একাই সে মৃতমাংস ছিঁড়েখুঁড়ে খায়। আহা, মানুষের জন্যেও যদি আল্লা এমন বিধান দিতেন হে! পথের ওপর পড়ে আছে খাদ্যখাওয়া, উপুড় হয়ে হামলে পড়ে দাঁতে তাকে তুলে নাও! কিন্তু আদম নবীর ওপর অভিশাপ আছে যে!

আমরা শুনেছি, বেহেশত থেকে তাড়িয়ে দেবার সময় আল্লা গর্জন করে উঠেছিলেন ক্রোধে, আদম! এতই তুই সাবালক হয়া গেছিস রে! এতই তোর আস্পদ্দা যে হামার নিষেধ না শুনিয়া গন্দম ভক্ষণ করিছিস ? যা এলা, দুনিয়ায় যা। হামার নিষেধ না শুনিবার দোষে অভিশাপ দিলোম তোকে— বেহেশতের মতো দুনিয়ায় তোর হাতের নাগালে খাদ্য জুটিবে না, কঠোর মেহন্নত করি খাদ্য তোকে ফলাইতে হইবে।

সেই অভিশাপ জগতের মানুষ এখনো বহন করে চলেছে।

আল্লা আরো অভিশাপ দেন, আর তুই হাওয়া বিবি! শখ করিয়া তোর নাম রাখিছিলোম রে। কত কল্পনা করিয়া না তোকে আদমের পাঞ্জর হতে হাড্ডি নিয়া গড়িছিলোম। আর তুই গন্দম ধরি আদমের কাছে যায়া, তাকে ভোজন করাইলি! দুনিয়ায় যায়া মজা টের পা এলা! সন্তানের জন্ম দিতে তোর যে কষ্ট হইবে, যে চিৎকার উঠিবে তোর গর্ভখালাশের, বৃক্ষ পর্বত থরথর করি উঠিবে তোর যন্তন্নায়, তবে না তুই সন্তানের মুখ দেখিতে পাবু!

সেই এক সন্তানই যে ঘুমন্ত ঘুমটিওয়ালার কাছে এসে এখন দাঁড়িয়েছে, তার হাত ধরে টানছে প্রথমে সে টের পায় নাই। সে ভেবেছে সেই কুকুরটা। আজ বাঁশবনে তার মড়া কোনো বাদুড় কি পাখি জোটে নাই। রাতে খাবে বলে ভাত আর ডাল কিছু পাতিলে আলাদা করে রেখে দিয়েছিল ঘুমটিওয়ালা, তারই গন্ধ শুঁকে শুঁকে কুকুরটা কি এসে ঘুমটিওয়ালার গায়ে থোত্না দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে ?

কুকুরটার সঙ্গে ভাব ছিল ঘুমটিওয়ালার। মাঝে মাঝে মুঠো দু'মুঠো ভাত ছড়িয়ে দিত তাকে। বলত, খা! তুইও খা, মুঁইও খাই। মঙ্গার দেশে খাদ্য নিয়ে আস্তাকুঁড়ে কাড়াকাড়ি করে কুকুর আর মানুষ। ঘুমটিওয়ালা বলে, কুত্তারও জেবন আছে, আল্লা হামাক যেমন জেবন দিছে, তাকেও দিছে। তবে মুঁই খায়া বাঁচিলে না তবে দান করা যায়!

কুকুরও নিশ্চয় মানুষটার মনের গতিক জানে। না, মানুষটা খারাপ নয়। কুঞ্জবাবু কি খবিরমিঞার মতো খচ্চর নয়। বিস্তর আছে ওই মানুষগুলোর, তবু হাতের মুঠি খোলে না তারা। লাঠি নিয়ে তাড়া করে। মানুষেরই পিঠ ভাঙে তাদের লাঠির চোটে, কুকুরের তো কথাই নাই! এ মানুষটা খচ্চর নয়। তাকে খেতে দেয়। কুকুরটা তাই চুরি করে পাতিলে মুখ দেয় না। ক্ষুদা পেলে, আহার না জুটলে, মড়া পচা লাশ না পেলে, ঘুমটিওয়ালার পায়ে এসে মাথা ঘষে, ঘুমিয়ে থাকলে কেঁই কেঁই করে ডাক পাড়ে।

ঘুমের অতলে ঘুমটিওয়ালা। ঘুম যেন আধকোশার শান্ত গভীর ধারা। সেই ধারায় দেহ ছেড়ে সাঁতারে ভেসে আছে সে। সেই কালে দেহে কার যেন মৃদু ধাক্কা। ঘুমের মধ্যেই কপাল কোঁচকায় সে। নিরিখ করবার চেষ্টা করে সেই কুকুরটাই কিনা। কপালের ভাঁজ গভীরতর হয়ে পড়ে। চোখের পাতা কুঞ্চিত হয়ে আসে। না! মনে তো হয় না! কেঁই কেঁই করে ডাকে কই ? কুকুরের থোত্না যে লালা ভেজানো, ভিজে ভিজে সেই পরশই বা কোথায়!

তবে কি এ কুকুরটা নয় ?

যদি হয়! ঘুমের আধকোশা জলে ঘুমটিওয়ালার হাত নড়ে ওঠে। কনুই দিয়ে ঘুমেরই ধারায় যেন ঢেউ তুলে ছোট এক সঞ্চরণ করে সে। কুকুরটা যদি হয়, তবে এই তাড়নায় সে লেজ গুটিয়ে দূরে সরে যাবে। লেজেরও বাহার নাই। ভোজন ঠিকমতো যার নাই, তার লেজেরও বাহার নাই।

কুকুরটা হলে সরে যেত, দেহের ওপর পরশের ধাক্কাটা সরে না। বরং আরো প্রবল হয়। তবে কি অন্য কিছু ওটি! বোঁজা চোখেই সে যেন মানুষের হাতের আভাস পায়। ধড়মর করে তখন সে উঠে বসে। ঘুমের জল ভেজা শরীর নিয়ে সে জেগে ওঠে জাগরণের পাড়ে। তাকিয়ে দেখে, সেই বালক। ডালিম গাছের সবগুলো ডালিম খাওয়া সেই শিশু। ডালিমের রক্তলাল রস এখনো তার মুখের কষে কালচে হয়ে লেগে আছে। যেন ফেরেশতার মতো নূরানী চেহারার ওপর দুঃখী দুনিয়ার একফোঁটা সিয়াকালো দাগ।

ঘুমভাঙা চোখে ঘুমটিওয়ালা ঠাহর করতে পারে না জগত। কুয়াশার মতো লাগে সব। চৈত্রের দুপুরে রেল লাইনের ওপর খররৌদ্র নাচে, নাচে আর বাষ্পের মতো কাঁপে। জগত সেই বাষ্প-নাচে থিরথির করে বাঁকাচোরা হয়ে যায়, ঝিলিমিলি কাঁপন ধরে উর্ধ্বমুখী হাত বাড়ায়। ঘুমটিওয়ালা চোখ পিটপিট করে। আরে দ্যাখো! চেয়ে দ্যাখো! বেলার ঢলই বা এখন কোন্‌মুখী! দিনের এই ম্লান ঘোলাটে আলো কি আসন্ন সন্ধ্যার নাকি প্রভাতের ? ডাকবাংলার মাথার ওপরে ওড়ে যে ওই নিশান, সে কি বাংলাদেশের সবুজের মধ্যে লাল, নাকি নীল লাল ট্যাঁড়া কাটা বৃটিশকালের নিশান ? ট্রেন কি এসে যায়, তাই তীব্র ডাক ছাড়ে হুইসিল ? নাকি তার স্মৃতির বাঁশি তাকে এখন চিরে দিয়ে যায় ?

সেদিন কিছুতেই তার ব্যাটা ভাত খাবে না। দুষ্টের কথা শোনো। রোজ রোজ নুন-ভাত খাওয়া যায় ? তেঁতুলের পাতা শুকনো খোলায় মচমচে করে ভাজলেও তাকে কি ভাতের পাতে ব্যঞ্জন বলা যায় ? না, সে খাবে না। মাছ দাও। মাছের সালোন দাও। মোয়া মাছ। বুকরঙ্গি মাছ। চচ্চড়ি কি ঝোল। নদী কি শুকিয়ে গেছে যে মাছ নাই ? নদীও তবে গরীবের জন্যে সম্বরণ করে রেখেছে তার রূপার টুকরোর মতো জীবন্ত সব শস্য ?

ব্যাটা বুঝ মানে না। ভাতের সানকি হাতে মা তার পেছন পেছন ব্যগ্রতা করে ছোটে।

আয়, বাপো, আয়। এক নলা ভাত খা। লুন দিঁছো। মরিচ একখান ডলি নিছোঁ। স্বাদ আছে, বাপো হে মোর। ফিরি আয়। মাওয়ের কোলে আয়। বাপো মোর, এক নলা খা।

না, খামো না!

না খাইলে যে রাজার হস্তীও পড়ি যায়!

রাজার হস্তীর ভুখ নাগে না।

কইছে তোক্!

রাজার হস্তীকে রাজা খাবার দেয়। তুই হামাকে খাবার দে।

এই যে খাবার।

মাছ কই ?

মাছ কাইল রান্ধিমো। খালের ধারে খলাই পাতি রাইখছি, বাপ।

মিছাও কথা।

উথালপাথাল দৌড় দেয় ব্যাটা। সানকি হাতে মাও দৌড়োয়। দৌড়ুতে দৌড়ুতে চোখের আড়াল হয়ে যায়। তাকে আর দেখা না যায়। মা তখন আদাড়েবাদাড়ে ডাক ছেড়ে ফেরে, কোন্ঠে রে তুই ? কোন্ঠে গেলি বাপো মোর ?

রেলের পাটির ওপর হঠাৎ তাকে দেখতে পায় ঘুমটিওয়ালা। আর কিছু মনে নাই তার। ক্রসিংয়ের ওপর শেকল তুলে ট্রেন পাস করাবার জন্যে সবুজ নিশান হাতে দাঁড়িয়েছিল সে। হুসহুস করে ট্রেন আসছে। ব্যাটা তার দৌড়ুচ্ছে রেলের পাটি ধরে।

একটা জীবন একটা কাল একটা স্মৃতির অন্তহীন ফিতের ফাঁস দৌড়ুচ্ছে সেই সঙ্গে। তারপরেই জগত অন্ধকার। রেলের পাটির ওপর ব্যাটার দেহ পুতুলের মতো দুইখণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘুমটিওয়ালা। তারপর কতকাল সে নিত্য আচমকা এমন দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাকিয়ে আছে— যেন এখনো ওইখানে দুইখণ্ড তার ব্যাটা।

কী থাকে জননীর যদি সন্তান তার যায় ? সেও যেতে চায় যেখানে সে গেছে। ব্যাটার মাকে ধরে রাখা মুশকিল হয় ঘুমটিওয়ালার। দিনের পর দিন এখন সে ঝাঁপ দিতে চায় ট্রেনের তলায়।

চিৎকার করে ডাকে, বাপো মোর, এক নলা ভাত খায়া যা।

সানকি আর হাতে নাই, তবু যেন সানকি ধরে আছে। হাত তুলে সে গগন ভেঙে ডাক দেয়। রেলের পাটির ওপর দিয়ে দৌড়োয়। ট্রেনের হুইসিল শুনলেই শরীরে তার বল এসে যায় রাজার হস্তীর। দড়ি দিয়ে তখন তাকে বেঁধে রাখতে হয়। দিনের পর দিন সে দড়িবাঁধা পড়ে থাকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাড়ে বুড়ো আমগাছটার গোড়ায়।

উন্মাদিনীরও হুঁশ থাকে, কৌশল বোধ থাকে। জননী বুঝে যায়, চিৎকার করে ডাক ভেঙে জানান দিয়ে সন্তানের কাছে যাওয়া যাবে না। পিতা তো গর্ভে ধরে নাই, গর্ভ তার কেঁদে উঠবে না, ওঠে না, তাই সে সন্তানহারা মাতাকে সন্তানের কাছে যেতে দেবে না, দেয় না। দড়ির ফাঁস গোপনে নিঃশব্দে খুলে সে অপেক্ষা করে।

হুইসিল বেজে ওঠে। ধ্বসধ্বস হসহস শব্দ ওঠে দিগন্ত কাঁপিয়ে, বৃক্ষের ডালে পক্ষী সকলকে চঞ্চল করে। পক্ষীরা গাছের ডালেই পা রেখে ডানা উঁচিয়ে রাখে মুহূর্তেই উড়াল দেবার প্রস্তুতি নিয়ে। আত্মাও উড়াল দেবার জন্যে তৈরি হয় জননীর। ট্রেন ওই ছুটে আসছে। আয়, আয়, বাপো মোর! নিঃশব্দে দৌড়ে এসে ট্রেনের নিচে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

তার কাটা দেহ পড়ে থাকে। ঘুমটিওয়ালার স্মরণ হয়, কালীবাড়ির উঠানে রাসলীলার কালে খোপে খোপে পুতুল সং। একটা পুতুল ছিল, এক জননীর দেহ দুইখণ্ড হয়ে আছে, তার পাশে রক্তমাখা কুঠার তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুত্র। পরশুরাম। জননীকে কুঠারের কোপে দুই খণ্ড করেছে সে। এও কি হতে পারে ? পুত্র কাটে জননীকে ? শাস্ত্র এত নিষ্ঠুর হয় ? জননীকে খণ্ডিত করার কথা শাস্ত্র এত ছন্দ করে রচনা করে ?

মনটা বড় অশান্ত হয়ে পড়ত পরশুরামের মাতৃহত্যার পুতুলসং দেখে। না, এখন আর ধন্দ লাগে না। এখন ঘুমটিওয়ালা মাথা নাড়ে আর বিড়বিড় করে ওঠে, হয় হয়! এও তো জগতে হয়! নিজের চক্ষে দেখিলোম হে! নছিমনের দেহখান রেলপাটির উপর দুই খণ্ড হয়া আছে। ব্যাটাই তো তার মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু জননী যে! জননীর বুকে দুধ শুকায়, তার গর্ভজলের ধারা শুকায় না। নছিমনের জীবন নাই, দেহের নিচে কোমর নাই, ছিটকে পড়ে আছে রক্তমাখা মাংসের দলা রেলের দু'পাশে, কিন্তু মাথাখানা যে আছে, মুখখানা যে থেঁতলে আছে, মুখের সেই ঠোটজোড়া তবু নাশ হয় নাই। ঠোঁট তখনো বিস্ফারিত, যেন তখনো ব্যাটাকে ডাকবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

বাপো মোর, ফিরি আয়! এক নলা ভাত খায়া যা রে!

শিয়রের কাছে দাঁড়ানো বালকের হাত খপ করে শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলে ঘুমটিওয়ালা, এতদিন পরে যদি এসেছে সে, পাছে যদি পালিয়ে যায়।

ব্যগ্র গলায় ঘুমটিওয়ালা প্রশ্ন করে, তোর নাম ?

বালকের উত্তর, ভাত খামো।

'ভাত খামো' কি নাম হতে পারে কারো ? মুহূর্তের জন্যে ঘুমটিওয়ালা ধন্দে পড়ে যায়। কিম্বা এতদিন পরে ফিরে এসেছে জননীর হাতে সানকিতে ধরা সেই ভাত খেতে। লবণ মাখানো ভাত। ব্যঞ্জন নাই সেই ভাত। মাছ নাই সেই ভোজনের জন্যে ফিরে এসেছে তার ব্যাটা হুড়কা ?

ঝড়ের নাম জলেশ্বরীতে হুড়কা। সেই এক তাণ্ডব হুড়কার রাতে জন্ম হয়েছিল তার ব্যাটার। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল হুড়কা।

ঘুমটিওয়ালা সজাগ হয়ে পুলিশের সূঁচালো জেরার মতো সরু গলায় জিগ্যেস করে, তোর নাম কি হুড়কা নয় ?

হুড়কা কোন্ঠে ? বালক আকাশের দিকে চোখ পাঠায়। না, আকাশে তো ঝড়ের মেঘ নাই।

ঘুমটিওয়ালার এতক্ষণে দিকদিশা ঠাহর হয়। না, এতক্ষণ সে ধন্দের মধ্যে ছিল। ঘুম থেকে সহজে ফেরা হয় না মানুষের। ঘুম এতক্ষণে তার চোখ থেকে নেমে ডালিম গাছের ফুলের বোঁটায় গিয়ে স্থির হয়। ফুলের ওপর বসেছে একটা প্রজাপতি। তার পাখা থিরথির করে কাঁপছে।

বালক ক্ষুধার্ত শুষ্কস্বরে বলে, প্রজাপতি মধু খায়।

হয়, বাপ। মধু খায়। ভাত খাবার চাস ? ভাত তোমাকে দেমো, রান্ধন করি ব্যঞ্জন দিয়া ভাত দেমো। তার আগে নামখান ক'।

পুকুরের বুকে ছোট্ট ঢিল পড়ার মতো বালক তার নাম বলে, কপিল!

কপিল ?

বালক চিৎকার করে ওঠে, হয়, হয়, কপিল! কপিল! ভুখে হামার প্যাট জ্বলি যায়। ভাত দেও।

আহা, সেই পুত্র সেই ছেলে সেই তার ব্যাটা না হয় নাই হলো, হতেও তো পারে ? মানুষ কি আবার ফিরে আসে না ? এই জন্মের পরে সবই কি কবরে যায় ? কবরেই পড়ে থাকে হাশরের মাঠ পর্যন্ত, যতদিন না আল্লা এসে উদয় হন পাপপুণ্য ওজনের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ?

তবে যে কালীবাড়ির কথকঠাকুর বলেন, কত জন্ম আগে ছিল, কত জন্ম আরো যে আসবে! বরং তার কথাই মনে ধরে অধিক। এ জীবন এক জীবনেই শেষ, ভাবতেই অবসন্ন হয়ে পড়ে দেহ। আবার ফিরে আসতে ইচ্ছা করে। এই পৃথিবীতেই যেন ফিরি। তবে, সে পৃথিবী যেন ভাতের সাগর হয়, আল্লা হে, শিবো হে, কালী হে, মা ফাতেমা তুমি তাই কোরো হে। সাগরের ঢেউয়ের মতো সংসারের পাড়ে এসে যেন ভাত আছড়ে পড়ে, পূর্ণিমায় যেমন জল আছড়ে ওঠে জোয়ারে।

তোমরা যাঁই উপরে আছেন হে, দয়া করিয়া এমন করো হে, চাউলের দানায়, ভাতের ফেনায়, গরম ভাতের উথলান্ ঢলে সংসার ভাসি যায়, আর সেই সংসারে মোকে আবার আনিও হে! এবারের যাত্রায় বড় কষ্ট গেইছে গো!

না, দয়া আছে ওপরওয়ালার। নইলে ব্যাপারীদের চালের গাড়ির মহিষ দুটো গতকালই কেন ঘুমটিঘরের কাছে এসে মুখে কষ তুলে দেহ ছেড়ে শুয়ে পড়বে ?

গাড়োয়ান হিমসিম খেয়ে যায় মহিষ দুটোকে ওঠাতে। ব্যাপারী নিজেরাও হাত লাগায়, নিজেরাও লাঠি দিয়ে পিটতে থাকে মহিষ দুটোকে। কিছুতেই কিছু হয় না। ওদিকে ইস্টিশানের মালগুদামে বস্তা ওজন করার টাইম প্রায় শেষ হয়-হয়। এরপরে আজ আর ওজন হবে না, মালবাবু আর বস্তা নেবেন না সন্ধ্যার ট্রেনে তোলার জন্যে। সারারাত কি তখন ইস্টিশানে মাথার ওপর শীতের ওষ আর অমাবস্যার অন্ধকার নিয়ে বসে থাকতে হবে ? সে বসে থাকার লোকসানও অনেক। দূরদূরান্তে বড় মহাজনেরা দেরিতে মাল আসার দরুণ জরিমানা কাটবে। আর গো-গাড়িওয়ালাদের নগদ টাকা খরচ করে খেতে হবে ইস্টিশানের হোটেল থেকে।

ব্যাপারীদের মুখে গালাগালের ঝড় বয়ে যায়। মহিষেরা নির্বিকার। ড্যাবাড্যাবা চোখ মেলে নিরীহ রকম তাকিয়ে থাকে। কিন্তু চোখের কোণে শয়তানিটা পাঠ করে ওঠে ঘুমটিওয়ালা। ডবল মাল গাড়িতে তুলেছে। সুযোগ বুঝে জানোয়ার দুটো এখন শোধ তুলছে পাহাড়ের মতো দেহ অসাড় করে অচল হয়ে।

ব্যাপারীদের কাছে ঘনিয়ে এসে ঘুমটিওয়ালা বলে, মুঁই এক ওষুধ জানি ইয়ার।

জানিস তুই ?

হয়, হয়।

তবে কর্ ওষুধ। পুরস্কার দেমো।

ঘুমটির ওপারেই বাঁশবন। বাঁশবনের ধারে ধারে জংলা গাছগাছালি। তার মধ্যে চোৎরা পাতা। পাতার গায়ে হাত পড়লেই জ্বলুনি। জ্বলুনির চোটে মানুষ লাফায়। ঘুমটিওয়ালা কচুপাতা ছিঁড়ে, সেই পাতায় হাত মুড়ে ঝট করে একগোছা চোৎরা পাতা ছিঁড়ে আনে। তারপর মহিষের মলদ্বারের দিকে চোৎরা পাতা তাক করে এগোয়।

ব্যাপার দেখেই গাড়োয়ানেরা হাঁ হাঁ করে ওঠে। ভাড়ায় এসেছে তারা। গাড়ি তাদের, মহিষ তাদের। মহিষকে চোৎরা লাগালে কাল ভোরের আগে জ্বলুনি থামবে না। হড়হড় করে পায়খানা হবে। শিং বাঁকিয়ে দশদিক ছোটাছুটি করবে। বেড়া ভাঙবে, ঘর ভাঙবে। গাড়োয়ানেরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

কিন্তু ততক্ষণে লাগানো হয়ে গেছে চোৎরা। যথাস্থানেই।

না, লাগাতেও হয় নাই। চোৎরা পাতার ঘ্রাণ পেতেই মহিষ দুটো লাফিয়ে উঠে পায়ের ওপর তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে পড়ে।

ঘুমটিওয়ালা হাসতে হাসতে বলে, তোমরাও যেমন! আরে, নগদে কি আর লাগাইতাম! জানেন তো না, ঘটের বুদ্ধি উজাড় করি আল্লা ক্যাবল মানুষকেই দেয় নাই, জানোয়ারের জইন্যেও দুইএক ফোঁটা রাখি দিছে তাঁই। চোৎরার ঘেরান পাইতেই দ্যাখেন কেমন চড়াক করি খাড়া হইছে!

মহিষ খাড়া করার পুরস্কার হিসেবে সের দুই তিন চাল তাকে দিয়ে যায় ব্যাপারীরা। এতখানি চাল এর আগে কখনো সে একদানে হাতে পায় নাই। ঘুমটিওয়ালা নিশ্চিত হয়, ফেরেশতার মতো অনিন্দ্যসুন্দর কপিল নামে এই বালকটির জন্যেই খোরাক মেপে গতকালই আল্লা তাকে এতখানি চাল দেয়।

ভাত রন্ধন করে ঘুমটিওয়ালা। বুকের মধ্যে টনটন করে— ব্যাটা তার মাছ খেতে চেয়েছিল। মাছ সে এখন পায় কোথায় ? আল্লার কাজ দ্যাখো, আল্লার কেমন লক্ষ্য! ঠিক সেই সময় বাঁশবনের ভেতর থেকে এক বৌঝি বেরিয়ে পড়ে ইতিউতি দেখতে দেখতে ঘুমটিঘরে আসে। অনেকদিনের সংসার তার, কিন্তু সন্তান হয় নাই আজও। মনে তার বড় দুঃখ। শ্বাশুড়ির শত গঞ্জনা।

আবাগীর বেটি মরিস না কেনে ? ব্যাটাক মোক আবার বিয়া দেমো।

ঘুমটিওয়ালা ভাবে, কাণ্ড দ্যাখো মানুষের। ভাতের জোগাড় নাই, সন্তান হয় না বলিয়া পাগল।

বৌটা মাঝেমাঝেই ঘুমটিওয়ালাকে বলে, যেইদিন তাঁই আরেক নারী ঘরে আনিবে, তোমার এই রেলের পাটির তলে মুঁই জেবন দেমো।

ঘুমটিওয়ালার বিস্ময় যায় না। দ্যাখো কাণ্ড, সন্তান হয় না তার জন্যে নয়, ভাতের অভাব তার জন্যে নয়, দ্বিতীয় নারী ঘরে আনবে তার জন্যে জীবন দিতে চায়! এ তবে কিসের ক্ষুধা যার জন্যে মানুষ এত পাগল হয়ে যায়! মনের টানও তবে এক ক্ষুধা!

সেই বৌটা এসে আঁচলের তলা থেকে মাটির এক খোরা বের করে সমুখে ধরে। খোরায় ট্যালট্যাল করছে ঝোল, সাঁতার কাটছে বেগুনের ফালি, তার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাছের আস্ত একখানা লেজ।

তোমার জন্যে আনিনু। ভাতার রাগ করি ভাত না খায়া উঠি গেইছে। মোরও রাগ আছে। তোমরা না খাও মোর মানুষ আছে। তোমার মতন বেদরদিয়া নয়। খান, চাচা, খায়া দ্যাখেন। ঝোল করিয়া ঝাল করিয়া রান্ধিছিনু শৈলের এই খণ্ডখানা। মাথাটা খাইছে শ্বাশুড়ি। বুড়ির খায়া প্যাট ভরে না!

ব্যঞ্জনের খোরাটা হাতে নিয়ে ঘুমটিওয়ালা বিড়বিড় করে ওঠে, আল্লায় দ্যাখো কপিলের জন্যে মাছও পাঠেয়া দিছে।

শোল মাছের লেজ, বেগুনের বেহেশতি স্বাদ, আগুনের মতো ঝাল, সানকির ভাত সবটা খেয়ে বালক বলে, আরো ভাত দেও।

আধসের পরিমাণ ভাত রেঁধেছিল ঘুমটিওয়ালা। নিজেও খাবে ছেলেটাও খাবে। আগে ছেলেটা খাক। সানকির ভাত চোখের নিমেষে গরাসে গরাসে নাই হয়ে যায়। ঘুমটিওয়ালা হাতের মুঠোয় করে ভাতের পর ভাত দিয়ে চলে। দিতে দিতে নিজের আহারের ভাতও শেষ। তারপর আর নাই। সানকিটা ঠেলে দিয়ে বালক রুষ্টস্বরে বলে, আর নাই কেনে ?

শিশুর খাওয়া দেখে নজর দিতে নাই। তবু বিস্ময় যায় না ঘুমটিওয়ালার। আধসের ভাত একবাটি সালোন দিয়ে মেখে খেয়ে উঠেও পেট তার ভরে নাই! আল্লাও তবে বালকের খোরাকের পরিমাণ নিজেও আন্দাজ করতে পারে নাই! ক্ষুধা কি তবে আল্লার নিজ হাতের সৃজন নয় যে খোরাক পাঠাতে তারও এমন ভুল হয়।

বালক হঠাৎ ক্রোধ ছেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ভুখে মোর প্যাট ভাঙি আসে। আরো ভাত খামো।

হাঁড়িতে তখন আবার ভাত চড়িয়ে দেয় ঘুমটিওয়ালা। রেল লাইনের ধারে আগুনের মতো ক্ষুধার্ত চোখ মেলে বসে থাকে বালক। যেন চোখের আগুনেই ভাতের রন্ধন ত্বরান্বিত সে করতে চায়।

চার

আশ্চর্য শক্তির মানুষ খ্যাতি পায় জগতে। চিৎ হয়ে বুকের ওপর হাতির পা নিয়ে যদি দেখাতে পার, নাম হবে। মুখের মধ্যে কাচের টুকরো কচকচ করে চিবোতে পার, নাম হবে। জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পার, নাম আছে। অতএব এক মহাখাদক হিসেবে কপিলের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে জলেশ্বরীতে। কিন্তু সে সার্কাসের বাজিকর নয়, ক্ষুধার সে গোলাম। তার ক্ষুধাই তাকে বিখ্যাত করে। ক্ষুধা চেনে না কে ? কিন্তু এমন ক্ষুধা তারা বাপের জন্মে দেখে নাই। মহাজনের গুদাম শেষ, পেট তবু ভরে না। কপিলের নাম প্রথমে আশেপাশে ছড়ায়, তারপর রেললাইন পেরিয়ে শহরে তার খ্যাতি পৌঁছায়। কে জানে ঢাকা রংপুরও এতদিনে কপিলের সংবাদ পেয়েছে কিনা।

ঈদের দিনে গরীব মানুষকে ভোজন করায় শহরের বড় মানুষ। তাই বলে সাধ করে তারা ভোজন করায় তা নয়। গরীবের ক্ষুধায় কাতর তারা নয়, কাতর তারা নিজের জন্যে। গরীব মানুষকে পরবের দিনে ভোজন করালে সওয়াব হয়, হাশরের মাঠে পুণ্যের দিকে পাল্লা ভারী হয়। যদি আল্লা বেহেশতে নেয়। বড় মানুষ এত খায় দুনিয়ায়, দমভর খেয়েও তাদের ক্ষুধা যায় না, বেহেশতের মেওয়া আর খাদ্যখাওয়ার দিকে চোখ ফেলে রাখে।

আল্লা যে খাদ্যখাবারের অভাব টানে, ভাতের জন্যে হাহাকারে দুনিয়া ভরে রেখেছেন, সেই তিনিই আবার অফুরান ভোজন দিয়ে রেখেছেন বেহেশতে। সেখানে হাত বাড়ালেই সোনার থালায় খোশবুদার গোশতো পোলাও ফিরনি পায়েস! বেহেশত কি তবে গরীব অনাহারী মানুষেরই কল্পনা সৃজন ?

সেই এক ঈদের দিনে খবিরমিঞার বাড়িতে প্রথম পাত পেড়ে বসেছিল কপিল। ঈদের দিন বলে কথা! বাতাসে গোশতো পোলাওয়ের ঘ্রাণ। এমন দিনে কপিলকে কি শুধু শাকভাত দেয়া যায় ? খবির মিঞার বাড়ির দিকে কপিলকে নিয়ে রওনা হয় ঘুমটিওয়ালা।

সেই সেদিন থেকে কপিল এখন ঘুমটিওয়ালার কাছে থাকে। ঘুমটিঘরেই সে ঘুমোয়। ট্রেনের টাইম হলে এখন সে দৌড়ে গিয়ে ঘুমটির শেকল নিজেই টানিয়ে সড়ক বন্ধ করে। মাঝে মাঝে সবুজ নিশান হাতে নিয়ে ট্রেনও পাস করায়।

একবার তো এই নিয়ে এক কাণ্ড। সবুজের চেয়ে লাল নিশানটাই ছিল তার পছন্দের। কিন্তু লাল নিশান ঘুমটিওয়ালা তার হাতে দিত না। তক্কে তক্কে থাকার পর একদিন— ঘুমটিওয়ালার পেট খারাপ হয়েছিল, ঘন ঘন দাস্ত, সেই কারণে ওঠার শক্তি নাই, কপিল নিঃশব্দে লাল নিশানখানা সরিয়ে পাতাচাপা দিয়ে রাখে আঙিনায়। তারপর ট্রেনের হুইসিল যেই শোনা যায়, কপিল লাল নিশানখানা তুলে দোলাতে থাকে। কপিলের জানা ছিল না লাল নিশানে ট্রেন থামে। ট্রেন যখন হুসহুস করে এসে আচমকা ঘটাংঘট বিকট শব্দ করে থেমে যায়, ড্রাইভার গার্ড সকল দৌড়ে নামে, ব্যাপার দেখে তাজ্জব হয়ে যায় কপিল। ঘুমটিওয়ালাও হাগুপাছা কাপড়ে ল্যাকপ্যাক করে ছুটে আসে 'আল্লা-আল্লা-কী-হইলোরে' বলে। ততক্ষণে লাল নিশানটা বালকের হাত থেকে গার্ড সাহেব কেড়ে নিয়েছে, ঘুমটিওয়ালাকে আসতে দেখেই গর্জন করে ওঠে সে। বিহারি গার্ড। মুখে উর্দু বোল্।

শালা হারামী, বাচ্চাকা খেল্ পায়া! লাল ঝান্ডা ইস্কা হাথ মে! শালা তুমহারা নোকরি হাম খায়া!

হাতেপায়ে ধরে সে যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। গার্ড সাহেব কপিলকে এক চড়ে শয়ান করে ফেলেছিল, ট্রেন চলে যায়, ঘুমটিওয়ালা কপিলকে বুকে তুলে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে কেবলি বলে চলে, টেরেন চলি যাউক, তারবাদে নিশান দেমো তোর হাতে, বাপো মোর যত ইচ্ছা নাল নিশান নিয়া খেলা করিস, বাপ।

দিনমানের ফাঁকা সময়ে কপিল লাল নিশান হাতে পেয়েও মলিন হয়ে থাকে। ট্রেনই যদি না থামল, তবে নিশান দুলিয়ে অঘোর সেই বিস্ময় কই ?

হাটের দিনে ব্যাপারীদের গাড়ি রেল পাটির ওপর দিয়ে চলাচল করে। মাঝেমাঝেই গাড়ির চাকা আটকে যায় তাদের। কপিল ঠেলে তুলে দেয়। দূরান্ত গ্রাম থেকে যাত্রী নিয়ে ইস্টিশানে বাস আসে প্রতিদিন ট্রেনের আগে। কবে সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সৈন্যদের এই বাসখানা নীলামে কিনেছিল আজগরমিঞা। সেই আজগর মিঞা যার তিন বৌ, তিন বৌ একসাথে নিয়ে সিনেমা দেখতে আসে আর মানুষেরা তার ছোট দুই বৌকে দেখে মনে করে তার বেটি দু'জন। বলে, বাহ! বেটি তো আপনার মাশাল্লা বেশ ডাঙর হইছে! বিয়া দিবেন কবে ?

সেই আজগরমিঞার বাস! এতদিনে পুরনো ঝঝ্ঝরে হয়ে গেছে। মাঝেমাঝেই বিকল হয়ে পড়ে। রেলের পাটির ওপর উঠতে গিয়ে হেঁচকি তুলে প্রায়ই তার এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। কপিল তখন ছুটে এসে ইঞ্জিন স্টার্টের হ্যান্ডেল ধরে যুবামানুষের শক্তি ধরে ঘরঘর করে ঘুরায়। ড্রাইভার এক্সেলটরে পা চেপে কসরত করে, চিৎকার করে, ঘুরা, ঘুরা, পুটকিতে জোর নাই ? শালার ব্যাটা জোরছে ঘুরা! হ্যান্ডেল ঘোরাতে ঘোরাতে কপিলের ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ জ্যান্ত হয়ে ওঠে এঞ্জিন, ঝঝ্ঝর করে কেঁপে ওঠে বাস। রেলের পাটি ঠেলে ইস্টিশানের দিকে গরগর করে ছুটে যায়। ঘুমটিওয়ালা বাধা দেয় না কপিলকে। ভাবে, এত আহারের পর তার শরীরের কিছু শ্রম হওয়া ভালো।

লাইনের ধারে ধারে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকারি আম গাছ। বুনো টক আম। সেই আম পেড়ে খায় কপিল। হাটের গাড়ি থেকে তাল গড়িয়ে পড়লে সেই তাল তার পেটে যায়। এমনকি আনাজ তরকারি পড়লেও পাকের অপেক্ষা নাই, যেটা কাঁচা খাওয়া যায় সেটাই তার পেটে যায় তৎক্ষণাৎ।

ডাকবাংলায় সরকারি মানুষ মেহমান হয়ে এলে মোরগ জবাই হয়। কপিল ঘুরঘুর করে, খানা শেষে মেহমানের যদি দয়া হয়। কিন্তু ডাকবাংলোর সালোন বাঁচলে কপিলের ভাগ্যে পড়ে না, চৌকিদার হাঁড়ি পুঁছে খেয়ে নেয়। কপিলকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে ভাগায়।

হারামীর হাড় চৌকিদার, মেহমানের পয়সায় অধিক করে রাঁধে, যেন তার মেহমান একজনের আহারের আন্দাজ নাই। মেহমান জেরা করলে মুর্খ মানুষের ভান করে মাথা চুলকোয়। আসল মতলব সেদিনের ভোজনটা তার যেন মেহমানের জন্যে রান্নার উদ্বৃত্ত দিয়েই সারা যায়। কপিল সবই বোঝে। তাই এক্ষেত্রে চুরিতে সে অপরাধ দেখে না। সে তাকে তাকে থাকে। একদিন সুযোগ মিলে যায়। ডাকবাংলার পেছনে পাকের ঘর। সেখান থেকে রান্না করা গন্ধ ওড়ানো খাসির সালোন একদিন সে হাঁড়ি সমেত নিঃশব্দে সরিয়ে আনে। রাস্তার ওপারেই কবরস্থান। সেখানে একটা কবর মসজিদের মতো গম্বুজ তুলে বাঁধানো। সেই কবরের ঘরে বসে সালোনের পুরো হাঁড়িটাই সে সাবাড় করে।

খাসির বড় তেজি ঘ্রাণ। তেল মশলায় জগত করে মাৎ। মুখে গোশতের গন্ধ পেয়ে ঘুমটিওয়ালার নিদ্রা ছুটে যায়।

হয় রে, তোর মুখে ঘেরান কি গোশতের পাই ?

কপিল চুরি করতে পারে, কিন্তু মিথ্যা সে এখন পর্যন্ত বলে নাই। পরেও আমরা এ বিষয়ে প্রশংসা তার শুনেছি। কপিল কখনো সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না। সেদিনও সে বলে নাই।

কপিল অম্লানমুখে তৎক্ষণাৎ স্বীকার যায়, পরিষ্কার বলে, হয় হয়, গোশতেরে ঘেরান। ডাকবাংলা হতে।

দিছে ? না, চুরি করিছিস ?

তুলিয়া নিছোঁ। চোকিদারের চোখ ফাঁকি দিয়া।

সব্বোনাশ! ইয়াকে তুলি আনা কয় না, বাপ! ইয়াকে কয় চুরি! বাপো রে, জগতের সকল পাপের গোড়ায় এক পাপ আছে, তার নাম চুরি। বড়মানুষের আসল পাপ, চুরি। শক্তিমানের একটাই পাপ, চুরি। চুরিতেই শক্তি, চুরিতেই মানুষ বড়মানুষ হয়, দুনিয়ার এই এক তাজ্জব ঘটনা। কচুগাছ কাটিতে কাটিতে মানুষ কাটা সহজ হয়া পড়ে। ছোট চুরি করিতে করিতে বড় চোর হয়। বাপো রে, চুরি করিলি তুই!

মোর যে ভুখ লাগিলো।

এত তোকে খাবার দেই, তবু তোর ভুখ লাগে রে হারামাজাদা ?

কথাটা বলেই সে ছি ছি করে ওঠে নিজেকে। এ কী গালি দিল অনাথ এই বালকটিকে! মনে মনে নিজের গালেই থাপ্পড় মারে সে নিজেকে। জড়িয়ে ধরে বালককে।

নিজে না খায়া তোকে খাওয়াই তবু তুই চুরি কইরতে গেইছিস রে আইজ!

ঘুমটিওয়ালার শোক উথলে ওঠে। ক্ষুধার জন্যেই তো! ক্ষুধার জন্যেই গরীব হয় চোর! আল্লা হে, জগতে যদি ক্ষুধা দিলে, আহার কেন দাও নাই ? চুরি করেও যদি অনাহারী মানুষ পেট ভরায়, তবে তো সে তোমার সৃষ্টিকেই বাঁচায়! মানুষ তো তোমারই সৃজন। খাদ্য চুরির কারণে পাপ দিও না তাকে। তার খাতায় তুমি সোয়াব লিখো, এই চুরিকে তুমি এবাদত বলে মঞ্জুর কোরো আল্লা হে।

ঘুমটিওয়ালা জানে শাকভাত ডালভাত খেতে খেতে বালক একসারা হয়ে গেছে। গোশতের ঘ্রাণ পেয়ে লোভ হয়েছিল। কিন্তু গোশতের আকাঙ্খা ঘুমটিওয়ালার নাই। কোনোদিন সে বড়মানুষ কারো বাড়ি যায় নাই গোশত খাওয়ার লোভে। বাবা কুতুবুদ্দিনের মাজারে খিচুড়ি গোশতের শিন্নি হয় প্রতি চাঁদে, টাউনের কত মানুষ ভোজন করে, ঘুমটিওয়ালা কোনোদিন সেখানে পাত পেড়ে বসে নাই। আজ কপিলের কারণে সে ঈদের দিনে খবিরমিঞার বাড়ির দিকে রওনা হয়। সঙ্গে কপিল। সেখানে আজ মিসকিন খাওয়ানো হবে।

পাত পেতে বসে যায় ঘুমটিওয়ালা কপিলকে পাশে নিয়ে। গরীব অনাহারী আরো জনকয় মানুষ ঢোকানো হয়েছে বাড়ির ভিতর উঠানে জামগাছের নিচে। তারপর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সদর দরোজা। দরোজার বাইরে গন্ডায় গন্ডায় মানুষ তখনো আওয়াজ করে, হামরা কি খামো না ? হামরা কি দোষ করিলুঁ!

যাও যাও, অন্য বাড়ি যাও। হেথায় কি ভাণ্ডার খোলা হইছে ?

তা ঠিক! ভাণ্ডার তো নয়! তবু ঘুমটিওয়ালার মন উচাটন হয়ে পড়ে। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। তার মনে হতে থাকে, বাইরে এতগুলো মানুষকে বঞ্চিত করে সে পাত পেতে বসেছে। মন খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে তার। কপিলের পাতে খিচুড়ি-পোলাও পড়তে না পড়তেই শেষ। চোখের নিমেষে পাহাড় শেষ করে হাতে চাটে সে। ক্ষুধার্ত চোখে পরিবেশনকারীদের হাতের গামলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘুমটিওয়ালা জানে তার ক্ষুধার পরিচয়। তার আহারের পরিমাণটাও তার জানা। কিন্তু এ বাইরের জগত, অপরের বাড়ি। এখানে বড় লজ্জার কথা। এতটুকু বালক এত খায়! জীবনে প্রথমবারের মতো ফকির মিসকিনের দলে বসে খাওয়া, গরাস এমনিতেই উঠছিল না ঘুমটিওয়ালার মুখে, সে নিজের পাত থেকে সবটা খিচুড়ি বালকের পাতে ঠেলে দেয়।

আরো দিবার কন!

চুপ! চুপ! ও কথা কওয়ার নয়। যা দেয়, তাতেই তুষ্ট থাক।

কপিল তখন নিজেই পরিবেশনকারীদের হাঁক পাড়ে, কী তোমরা! দ্যাখেন না কেনে ? পাতে যে মোর কিছু নাই!

এই যে দিলোম তোমাকে!

পরিবেশনকারীরা অবাক হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি তো পাত খালি হওয়ার কথা নয়। তবে কি বালককে পরিবেশন না করেই তারা গামলা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় সারির দিকে ? ফিরে এসে আবার তারা কপিলের পাতে খিচুড়ি ঢেলে দেয়। তাদের চোখের সমুখেই গরাসে গরাসে খিচুড়ি সবটা খেয়ে আবার সে চোখ তুলে তাকায়। চোখে তার দাবি ঝকঝক করছে, আরো দাও!

স্থির একটা চিত্র। পরিবেশনকারীরা স্তম্ভিত, কপিল তাকিয়ে আছে তাদের চোখে চোখ স্থির রেখে। তারপরই হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গামলা কেড়ে নিয়ে কব্জি ডুবিয়ে দেয়, গরাসের পর গরাস মুখে পুরতে থাকে।

ঈদের দিনে রাগঝাঁক করতে নাই। ঈদের দিনে ঈমানদারের পরীক্ষা নেন আল্লা। ফকির মিসকিন গরীবের জন্যে দিলের মধ্যে রহম আছে কিনা আল্লা পরীক্ষা করে দেখেন। কিন্তু এত সুনীতির কথায় মুহূর্তে আগুন ধরে যায় বালকের কাণ্ড দেখে। খিচুড়ি পরিবেশনের লোহার লম্বা হাত তুলে পরিবেশনকারীরা বালককে মারতে ওঠে।

শালার ব্যাটা শালা। জন্মের খাওয়া তোর পুটকি ভরি দেমো আইজ।

হৈচৈ শুনে খবিরমিঞা ছুটে আসেন।

কী হইছে ? কী হয় ?

ঘুমটিওয়ালা থরথর করে কেঁপে ওঠে। আজ আর রক্ষা নাই। কপিলের বুঝি মাথা ফাটায় আজ খবিরমিঞা। কিন্তু তিনি ঘটনা শুনে কপিলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে পিটপিট করে হেসে ওঠেন। বলেন, খাবু তুই ? দেখি তুই কত খাবার পারিস।

তারপর নিজ হাতে তিনি হাতা ধরে, হাঁড়ি থেকে নিজে খিচুড়ি তুলে কপিলের পাতে পাহাড় করে দেন। গোশতো উপুড় করে দেন। দেখতে দেখতে হাঁড়ি পাতিল সব খালি হয়ে যায়।

বিস্ময়কর সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে খবিরমিঞার চোখের সমুখে গরীব এই বালক রূপান্তরিত হতে থাকে ফেরেশতায়। অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ছিল কপিলের। দীনদরিদ্র সে, অনাথ সে, তবু তার চেহারার দীপ্তি মরে নাই।

ঘোরলাগা গলায় খবিরমিঞা ঘুমটিওয়ালাকে বলেন, এই চ্যাংড়া তোমার ?

নয়!

ঘুমটিওয়ালা মাথা নাড়ে।

তবে কার ?

ঘুমটিওয়ালা আকাশের দিকে চোখের একটা পলক গভীর ইশারা করে বলে, উপরআলার।

খবিরমিঞার সন্দেহ যায় না। বলেন, তোর না ব্যাটা ছিলো রেলের তলায় কাটা পড়িছিলো ?

ঘুমটিওয়ালা বলে, তার বদলে আল্লা হামাকে এই চ্যাংড়া পাঠেয়া দিছে। ভাত না খায়া কাটা পড়ে, মাও তার ভাতের সানকি ধরি ছুট পাড়ে, জন্মের সেই ভাতের ভুখ নিয়া ফিরি আসিছে হামার ব্যাটা হুড়কা নউতুন নাম নাম নিয়া। ইয়ার নাম কপিল।

আমরা অনুমান করি শহরের নামী মোক্তার, মুসলিম লীগের নেতা এই খবিরমিঞাই কোর্টকাছারিতে কি রাজনীতির আড্ডার আসরে কপিলের কথা গল্প করে বলে থাকবেন। কারণ এরপর পরই কপিলের ডাক পড়তে থাকে বড়মানুষদের বাড়িতে বাড়িতে। পালাপরব ছাড়াই কপিলকে তাঁরা ডেকে পাঠাতে থাকেন ভোজনের জন্যে।

বড়মানুষদের গৃহিনীরা বড় মজা পান। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রান্না করে কপিলকে তারা উঠানে বসিয়ে খাওয়ান। কাজের বেটি পরিবেশন করে, দুয়ার ধরে তাঁরা তামাশা দেখেন। জগতে সকল সুখই তাদের ঘরে জমা জন্ম থেকে, এ সকল তারা অদ্ভুত বলে বিবেচনা করে না। অদ্ভুতের স্বাদ তারা কপিলকে দেখে পায়। তাদের মাথার ঘোমটা পড়ে যায় কপিলের ভোজন দৃশ্য দেখে। এক হাঁড়ি ভাত নিমেষে উধাও! এক ছড়া কলা দেখতে দেখতে নাই! যাবার কালে কোঁচড় ভরে চিড়ামুড়ি দাও, ঘুমটিঘর পর্যন্ত যেতে না যেতেই কোঁচড় শেষ!

সারা জলেশ্বরীতে নাম পড়ে যায় কপিলের। ভোজন-বীর বলে তাকে নাম দেয় কেউ কেউ। মঙ্গার দেশে ভোজনের গল্প ওঠে কত। কেউ কেউ বলে সেইসব দিনের কথা, বাংলায় যখন দুধের সাগর বহে যেত, ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠত, আউশ আমনের সেদ্ধ গন্ধে ভুরভুর করত দিকদিগন্ত। মানুষেরা তখন ভোজন করত বটে। একটা পুরো খাসী এক বসায় খেয়ে উঠত মানুষ। রুইয়ের আস্তমাথা এক থাবায় ভেঙে চোখের নিমেষে চুষে খেত। এক কুড়ি আম খাওয়া তো হেলা খেলা। ঘন আউটা দুধ এক হাঁড়ি এক চুমুকে শেষ। তারপরও বলত, গুড় সন্দেশ যদি থাকিয়া থাকে, তবে দেন কয়টা! চাখিয়া দেখি!

না হে না, সেসব গল্পকথা!

প্রতিবাদও হতো। হাটেবাজারে কোর্টকাছারির মাঠে অনেকেই প্রতিবাদ করে উঠত।

কাঁই কয় গল্পকথা! এ সকলই সত্য ছিলো হে। বাংলার নাম একদিন দুনিয়াতে ছিলো। একাত্তরের সংগ্রামের সময় বাংলার নাম দুনিয়া জানিতো। মনে নাই ? বাংলার নামে পাকিস্তান থরথর করি কাঁপিয়া উঠিছিলো। বঙ্গবন্ধুকে সাবাশী দিছে দুনিয়া। হাঁ, মানুষের ভাতের অধিকার নিয়া সংগ্রাম করিছে বটে তাঁই। অন্যপরে কথা কি, এলাকার মহিউদ্দিনের কথা তোমরা ভুলি গেইছেন ? হামার এলাকার সন্তান, মায়ের কোলের সন্তান তাঁই, দ্যাখ না দ্যাখ চোখের দেখা মানুষ তাঁই, বন্দুক হাতে ইবলিসের সাথে যুদ্ধ তাঁইও করিছিলো। সেই ইবলিসের নাম পাকিস্তান। আইজ হামার নিজের দোষে সব তল হয়া গেছে, বাংলার দিন পড়িয়া গেছে, আল্লা মুখ ফিরি নিছে মানুষ হতে। মানুষের খাতা হতে বাংলার নাম কাটি গেইছে!

এতবড় বিষণ্ণতার ভেতরেও আবার ফিরে আসে কপিলের কথা। লোকেরা ক্ষুব্ধস্বরে বলে, ক্ষুধায় তাকে ভোজন দিয়া বড় মানুষেরা আপন দোষ ঢাকিতে চায়। তাই তাকে ভোজন দেয়। ভোজন কি তামাশা হে! তামাশাই যদি না ভাবিবেন, তবে দ্যান কেনে, টাউনের তামাম অনাহারীকে একবেলা ডাকিয়া ভোজন দ্যান। তবে বুঝি তোমার অন্তর। অন্তর যার নাই তারাই বড়মানুষ। এই বড় মানুষেরাই বাংলাকে শ্যাষ করিলো, বাহে!

ঘুমটিওয়ালার মনে পড়ে মহিউদ্দিনের কথা। এখনো সে চোখেই দেখতে পায়, ওই মহিউদ্দিন এসে তার ঘুমটিঘরের ভেতরে দাঁড়াল। বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে তার। টপটপ করে পানি পড়ছে বস্ত্র থেকে। এখন এদিকে আর মিলিটারি নাই। সন্ধ্যাকালেই তারা জলেশ্বরী থেকে, জলেশ্বরীর ডাকবাংলা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে রংপুরের দিকে রওনা হয়ে গেছে সব। ঘুমটিওয়ালা শোনাশোন শুনেছে, মিলিটারি পিছু হটছে। মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসছে। মিলিটারিকে তাড়া করছে। একটাকেও তারা জীবিত ফিরে যেতে দেবে না রংপুরে। একজনকেও পালাতে দেবে না।

মহিউদ্দিনের হাতে বন্দুক। সেই একবার ট্রেন থেকে মিলিটারি নেমেছিল, তাদের বন্দুক দেখেছিল সে এত কাছ থেকে, আর আজ এই মহিউদ্দিনের হাতে দেখল। সেদিন আজরাইলের মতো মনে হয়েছিল বন্দুক হাতে মানুষকে, আজ আরেক মানুষ যে এসে তার ঘরের ভেতরে বন্দুক হাতে খাড়া তাকে ফেরেশতার মতো দেখায়। ফেরেশতা নয় তো কী! নইলে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস এত সরল লাগে কেন এতদিনের রুদ্ধচাপা শ্বাসের পর ?

মাঝে মাঝে বিজলির ঝলক। সেই ঝলকে বন্দুকের নল প্রকাশ হয় থেকে থেকে। ঘুমটিওয়ালা সম্মোহিত হয়ে যায়। মানুষটা যে ঘরে এসেছে সে কিছু না, বন্দুকটা তাকে টানে। বন্দুকের গায়ে জীবনে সেই প্রথম হাত রেখেছিল ঘুমটিওয়ালা। মহিউদ্দিন মাথা মুছছে। ঘন কালো চুলের জঙ্গল থেকে বৃষ্টির পানি ঘষে ঘষে বের করছে। বন্দুকটা চৌকির ওপর রাখা। সেই অবসরে বন্দুকের গায়ে চট করে হাত দিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে তার হাত। যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে। ইস্ কী ঠাণ্ডা। যম ঠাণ্ডা। যার মুখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে দুশমনের বুকে লাগে, তার গা কেন এমন ঠাণ্ডা!

মহিউদ্দিন বলে, ডরাইছেন ? ডর না করেন। দরকারে তোমাকেও বন্দুক হাতে নিতে হইবে। দুশমন এলাও শ্যাষ হয় নাই। তোমার জানের দুশমন। তোমার ভাতের দুশমন। তোমার সন্তানের দুশমন।

সন্তানের কথা মনে পড়ে যায় ঘুমটিওয়ালার। হো হো করে কেঁদে ওঠে সে। মুহূর্তে চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝরে বাইরের অগাধ ওই বৃষ্টিধারার মতো। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। ডালিমগাছের ডাল ঝড়ের হাওয়ায় মাথা আছড়ায়, ঘুমটিঘরের টিনের বেড়ায় মাথা ঘষে।

মহিউদ্দিন বলে, জানি, তোমার এক সন্তান ছিলো, রেলের তলায় কাটা গেইছে। তারে জন্যে এলাও তোমার চোখের পানি শুকায় নাই। এলাও তোমার চোখের পানি পড়ে। তবে একবার মায়ের মতো হামার এই মাটির কথা চিন্তা করি দ্যাখেন তো! এই মাটি যে জননী হয় সেই জননীর কত সন্তান কাটা গেইছে। রেলের চাকা তাকে কাটে নাই, হামার উপর রাজ করিতে চায় যারা তারাই তাকে কাটিছে। হামার ভাত কাড়িতে যারা চায় তারাই কাটিছে। এই মাটির লাখো সন্তানকে তারা খুন করিছে। মাটি কান্দে, বাংলা কান্দে, বাংলার আসমান কান্দে। দ্যাখেন বিষ্টি কেমন ঝরে, হামার মাটি মায়ের চক্ষের পানি ঝরে।

মহিউদ্দিন অপেক্ষা করে চৌকির ওপর বসে। তার অগ্রগামী দল এগিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা এখন কোথায়, সেটা নির্ণয় করতে। এদিকে তার জ্বরও এসেছে ভীষণ। অবসন্ন তার শরীর। থরথর করে শরীর কাঁপছে। তারওপর এই ধুম বৃষ্টিতে ভেজা! মহিউদ্দিনের চোখে সব ধোঁয়ার মতো হয়ে যায়, আবার বাস্তবতা ফিরে আসে বাস্তবতার আকারে।

ঘুমটিওয়ালা ব্যগ্রস্বরে জিগ্যেস করে, তোমরা যে দুশমন মারিয়া দ্যাশ স্বাধীন করিবেন, স্বাধীন হইলে নিশ্চিন্তে অগাধ ভাত হামার জুটিবে ?

মহিউদ্দিন থম ধরে বসে থাকে। উত্তরটা তার মাথায় আসছে না ? নাকি জ্বরের ধমকে মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে ?

ঘরের ভেতরে অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মহিউদ্দিনকে ভালো করে ঠাহর হয় না তার। অন্ধকারকেই লক্ষ্য করে ঘুমটিওয়ালা আবার জিগ্যেস করে, অধিকতর ব্যগ্রস্বরে, কন, তোমরা যে বন্দুক হাতে যুদ্ধ করেন, ভাত জুটিবে তবে ?

অন্ধকারের ভেতর থেকে ছমছমে স্বর ভেসে আসে মহিউদ্দিনের।

আগে মাটি তো পাইবেন। যে মাটি দুশমন কবজা করি নিছে, সেই মাটি ফিরৎ পাইবেন।

তার বাদে ?

মাটির অধিকার পাইবেন।

কথাটা বুঝতে পারে না ঘুমটিওয়ালা।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মহিউদ্দিন আবার বলে, মানুষের মতো মানুষ হইবেন। মানুষের অধিকার পাইবেন।

অধিকার কী বস্তু জানা নাই ঘুমটিওয়ালার। অধিকার শব্দটা তার কাছে পাথরের মতো ভারী কিছু বলে ঠাহর হয়। সেই অনুমানে সে বলে, দাদা হে, অধিকারে তো অনাহারীর প্যাট ভরিবে না। ভুখ যাইবে না। ভাত হইবে কিনা কন।

মহিউদ্দিন বুঝতে পারে অনাহারী মানুষ অধিকার বোঝে না, ভাত বোঝে। সে বলে, তোমার ভাতের জোগাড়েই তো বন্দুক হাতে নিছি হে। মাটি ফিরিয়া আসিলে ভাতের দুঃখও তোমার যাইবে।

আমরা এখন বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। মাটি তো ফিরে এসেছে আমাদের কাছে, ভাত কি এসেছে ?

দমকা হাওয়া ওঠে। ঘুমটিঘরের দরোজা খুলে যায়। না, বাতাস ঠেলা দেয় নাই। মহিউদ্দিনের মানুষেরা ফিরে এসেছে। অন্ধকারের ভেতর তাদের স্বর শোনা যায়।

না, ডাকবাংলায় কেহ নাই। ওপারে নবগ্রামের সড়ক। সেই সড়ক সুনসান। গাঁয়ের মানুষ কয়জন সম্বাদ দিলো, মিলিটারি এলা নবগ্রামে পৌঁছি গেইছে। বিষ্টির তোড়ে চলা থামাইছে তারা। নবগ্রামের ইস্টিশানঘরে বুঝি আশ্রয় নিছে। চলো, চলো।

তারপর পায়ের শব্দ। বৃষ্টির শব্দ। গাছের মাথা ঘষার শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ বিজলির চমক। সেই চমকে রেলের পাটি ছুরির মতো চকচক করে ওঠে। দলবল নিয়ে মহিউদ্দিন দ্রুত বেরিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে এখন আর কেউ নেই। এখন শুধু ঘুমটিওয়ালা একা। দরোজার পাট হাওয়ার তোড়ে আছড়াতে থাকে। ধপাস ধপাস শব্দ ওঠে। দরোজা যেন মাথা কুটতে কুটতে শব্দ করে বলে চলে, ভাত! ভাত!

ভাতের ক্ষুধা যায় না কপিলের। দিনে দিনে বড় হতে থাকে সে। ক্ষুধাও তার আরো বাড়ে। জগতের সব অনাহারীর ক্ষুধা যেন তার ওপরে ভর করে ওঠে। লোকেরা তাকে ভোজন করায়। কুতুবুদ্দিনের মাজারে তার খিচুড়ি শিন্নির ভোজন বাঁধা। খবিরমিঞা, এখলাসমিঞা, নছরমিঞা, ফকরমিঞা, রহমানমিঞা, আলেফমিঞা, জলেশ্বরীর সব বড় মানুষেরা তাকে মাঝে মাঝেই ভোজন করায়। কালীবাড়িতেও তার প্রসাদ জোটে। ব্যাপারীরা চালডাল দিয়ে যায়।

কুঞ্জবাবু মারা গেল। সে কৃপণ হতে পারে, তার ব্যাটা তো আর নয়! কৃপণের ব্যাটা কৃপণ হয় না। কথায় আছে না, শাক-ভাতে বাপ করে টাকা, ব্যাটা সেই টাকা উড়ায় ঘি-ভাতে! বিরাট শ্রাদ্ধ করে কুঞ্জবাবুর ব্যাটা। সেখানেও কপিল।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিনে বছর বছর গরীব খাওয়ানো হয়। কিছুদিন বাদে জিয়ার মৃত্যুদিনেও টাউনের আরেক দল নেতা গরীব খাওয়াতে শুরু করে বছর বছর। দুই দলের নেতারা পাল্লাপাল্লি করে গরীব ভোজন করায়। ভোজনের স্থান সেই একই জায়গায়, ঈদগা-র ময়দানে। আল্লার ঈদগা রাজনীতির কারণে কারোর একচেটিয়া হয় নাই। কিন্তু একই ঈদগা-র ময়দানে একদলের আয়োজনে আরেক দল নাই। তাদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নাই। দুই দলই টানাটানি করে একই গরীব মানুষ নিয়ে। গরীবের কোনো দল নাই। অনাহারীর কাছে রাজনীতি নাই।

গরাসে গরাসে ভাত গেলে কপিল। তবু তার ক্ষুধা যায় না।

এদিকে এক নতুন ব্যাপার লক্ষ করা যায়। হাতেপায়ে কপিল যত বড় হতে থাকে লোকের বাড়িতে ক্রিয়াকর্মে পালাপরবে কালীবাড়িতে কি ঈদগা-র মাঠে ভোজনের ডাক তার কমে আসতে থাকে। তবু সে যায়, ক্ষুধা বলে কথা! কিন্তু আগের মতো কেউ তাকে বিশেষ খাতির করে বসায় না পাতে। পাতেও তারা আগের মতো অঢেল তাকে ঢেলে দেয় না। দু'চার হাতা ভাত কি খিচুড়ি দিয়েই তাগাদা দেয়, যাও, যথেষ্ট হইছে, উঠি পড়ো!

বালক একজন এত ভাত খেতে পারে, সে ছিল এক তামাশার দৃশ্য। যতই সে বড় হয়, লোকের কাছে তামাশাটা মলিন হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ যদি ননি চুরি করে খায়, তবে সেটা তার বাল্যকালে শোভা পায়! মায়ে তখন মুখ চুম্বন করে। যুবাকালে কৃষ্ণ চুরি করে, ননী আর নয়, বস্ত্র! নারীর বস্ত্র! লোকেরা তখন রসের গীত রচনা করে।

আহারের কিন্তু বাল্যকাল যুবাকাল নাই। ক্ষুধার কোনো কালাকাল নাই। বয়স যত বাড়ে কপিলের ক্ষুধাও তত বিপুল হয়ে ওঠে। লোকেরা সন্দেহ করে ওঠে।

সন্দেহ! সন্দেহটা কিসের ?

কপিলের অনিন্দ্যসুন্দর চেহারার দীপ্তিটা লোকের কাছে ক্রমেই এখন অন্যকিছু বলে বোধ হতে থাকে। শয়তান নয় তো! দুষ্ট জ্বিন নয় তো! ফেরেশতার সুরত ধরে এসেছে! মানুষ রূপে জলেশ্বরীতে হানা দিয়েছে!

আচ্চয্য কী বাহে! শোনেন নাই, পরীর যে কথা শোনেন, পরীর রূপের কথা শুনিয়া পাগল হয়া যান, আসলে একেক কালে পরীর সুরত ধরি দেখা দেয় কলেরা! আসলে কলেরা তাঁই। যে গাঁও দিয়া সেই কলেরা-পরী হাঁটি যায়, সেই গাঁয়ে রাইত না পোহাইতেই বাড়ি বাড়ি উচ্ছন্ন হয়া যায় কলেরায়।

পুবদিকেই কামরূপ-কামাখ্যার দেশ। এখন না হয় সীমান্তের ওপারে পড়ে গেছে সেই কামরূপ-কামাখ্যা, কিন্তু স্মৃতির কোনো সীমান্ত নাই। কিংবদন্তীর গল্পকথার ওপরে কেউ ভিসা-পাসপোর্ট বসাতে পারে নাই।

লোকেরা বলে, শোনেন নাই, কামরূপ-কামাখ্যা হতে সুন্দরী নারী নামি আসে! ঘটের মতোন স্তন তার, পূন্নিমার চান্দের মতোন মুখ। আসিয়া তারা যুবকের কানে ফিসফিসায়, চলো হে হামার দ্যাশে! তোমাকে মোর যৈবন দেমো, সোনার খাটে শুতি থাইকবেন, রূপার পাংখা ধরি হাওয়া করিম তোমাকে। হাতের তালুর পরে দুধ চাউল রাখিয়া মোর শাড়ির আঞ্চল পুড়িয়া পায়েস রান্ধি তোমাকে খাওয়ামো হে, চলেন হামার দ্যাশে।

তারপর কী হয় ? যুবকেরা কামরূপ-কামাখ্যার দেশে সেই নারীর পেছন পেছন চলে যায়। নারীর ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় যুবক রাখে পা, ছায়ায়া-ছায়ায় পা রেখে তারা যেতে থাকে, যেতেই থাকে। তারপরে যেই তারা পৌঁছোয় কামরূপ-কামাখ্যার দেশে, মুহূর্তে মিলিয়ে যায় ছায়া, নারীমুখ ঘুরে দাঁড়ায়। তখন আর নারীর মুখ নয় তার। চুলের বিনুনিও আর চিকন নয়। উন্মাদিনীর মতো বাতাসে ওড়ে চুল। লোলজিহ্বা ঝুলে পড়ে মুখের গহ্বর থেকে। পূর্ণিমার মতো রূপ তার অমাবস্যার মতো বিকট হয়ে পড়ে চোখের নিমেষে। ডালিমের দানার মতো দাঁত হয়ে পড়ে গজালের মতো দীর্ঘ সূচাল। যুবক অজ্ঞান হয়া যায়। চেতন ফিরিলে দ্যাখে সব্বোনাশ! পাগল হয়া দ্যাখে, যুবক আর মানুষের আকারে নাই, ভেড়া হয়া গেইছে।

লোকেরা বলে, সোনার সংসার উচ্ছন্ন করার জন্যে যুবকদের ভুলিয়ে নিয়ে যায় কামরূপের নারী। সাবধান! সাবধান থাকিবেন হে! মায়ায় তোমরা ভুলিলেন কি গেইলেন!

কপিলও কি অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ধরে এসেছে গোপন অশুভ কোনো কারণে ? লোকেদের মন ছনমন করে। বিশ্বাস কী! হতেও তো পারে। নইলে এত ক্ষুধা ধরে মানুষের মনে এত মায়া জাগাবার উদ্দেশ্য কী তার ?

কেউ আবার আরেক ইতিহাস বলে।

শোনেন তবে। বাংলার উপরে মিলিটারি আক্রমণ করিবার আগের কথা। টেরেন হতে জলেশ্বরীর ইস্টিশানে এক অচিন মানুষ নামিলো। সাহেবের মতো চেহারাখানা তার। টেরেন হতে নামিয়াই তাঁই টাউনের ভিতরে যায়। হাঁটিতে হাঁটিতে যায়। কারো সাথে কথা না কয়। কোথায় বা যাইবে তার উদ্দিশ না পাওয়া যায়। তামাম টাউন ঘুরি আসি আধকোশা নদীর কিনারে খাড়া হয়। তারপর সেই নদীর পাড়ে তাঁই দুই হাতে তালি দিতেই তার দোনো হাতে ফস করি জ্বলি ওঠে আগুন। সেই আগুনে নদীর ওপার পয্যন্ত আলোক হয়া যায়। লাল আলোক।

এ ইতিহাস আমরা শুনেছি। আমাদের বড়ভাই মনসুরদা বলেন, আসলে লোকটি ছিল ম্যাজিশিয়ান। জলেশ্বরীতে এসেছিল ম্যাজিক শো করবার ধান্দায়। শহর ঘুরে সে আন্দাজ করছিল এখানে শো করলে তার লাভ আছে কিনা। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মনসুরদা দিলেও, তিনি একজন, বিপরীতে অনেক মানুষ। সেই মানুষগুলোর নিশ্চিত বিশ্বাস, জলেশ্বরীতে যে একদিন পাকিস্তানি মিলিটারি নামবে, তারা আগুন জ্বালিয়ে দেবে এখানে, মানুষের বসতি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, লোকটা আল্লারই তরফ থেকে এসেছিল মানুষের রূপ ধরে, মানুষের সেই ঘোর ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্যে।

শোনেন নাই, আধকোশার পাড়ে যায়া খাঁড়া হয় তাঁই ? আধকোশার পাড়ে কেনে ?

মানুষের কাছে ব্যাখ্যা আছে এরও।

মানুষটা ইশারা করি দেখাইতে চায় আধকোশার ওপারে গেলেই তবে মানুষের জান রক্ষা পাইবে। নয় নিশ্চিহ্ন হয়া যাইবে মিলিটারির হাতে। তাই নদীর পাড়ে যায়া সে হাতে তালি মারি আগুন জ্বালায়, আগুনের আলোকে নদীর ওপার পয্যন্ত আলোক করিয়া পথ দেখায় যে এই পথ ধরি যাওয়ার কাম!

মানুষেরা এ কথা বিশ্বাস করে। কারণ, মিলিটারি যখন সত্যি সত্যি জলেশ্বরীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন মহিউদ্দিন তো শহরবাসী সবাইকে নদীর ওপারেই সরে যাবার জন্যে ডাক দেয়।

কিন্তু কপিলের প্রসঙ্গে শুভ সংকেত দেখে না মানুষ।

ঘুমটিওয়ালাও একদিন লক্ষ করে তার ডালিম গাছে একটাও ফুল ধরে নাই। ডালিম আর ফলে না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে সরকারি আমগাছেও এবার একটিও আম ধরে নাই। মুকুল ধরতে না ধরতেই ঝরে পড়ে গেছে। ব্যাপারীদেরও দেখা যায় অবসন্ন হয়ে মাঠের কিনারে বসে থাকতে। ধানের শিষে ধান নয়, ছাইয়ের মতো তুষ। নদীর পানিতে মাছও ক্রমে বিরল।

তবে কি কপিল আসলে মানুষের ছদ্মবেশে দুর্ভিক্ষের দূত ? জগতগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সে এসেছে মানুষের সকল খাদ্য উদরে পুরে সোনার দেশ শ্মশান করতে ?

এ কথাটাও যেন ঠিক খাপে খাপ বসে না! সোনার দেশ, একটা কথার কথা। চারদিকে ভস্ম ওড়ে আজ। বন্দুকে মরচে ধরে। মহিউদ্দিনের কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার ভাতের সংগ্রামও হাহাকারের নিচে চাপা পড়ে যায়। সূর্য অস্ত যাবার আগেই আধকোশার পানি দুপুরেই লাল রঙ ধরে ওঠে।

ঘুমটিওয়ালা কপিলকে কম্পিতস্বরে জিগ্যেস করে, তোর নামখানা কি সত্যসত্যই কপিল রে ?

কেনে ? অ্যাতোদিন বাদে তোমার এই সওয়াল ?

কপিলকে তার বালকবেলায় প্রথম দেখে ঘুমটিওয়ালার মনে হয়েছিল তারই সেই রেলে কাটা পড়া ব্যাটাই বুঝি! সেই হাগুড়া! তুমুল ঝড়বৃষ্টির দিনে জন্ম নেয়া তার সেই সন্তান। এখনো ঘুমটিওয়ালা মনে করে সেই ব্যাটাই তার ফিরে এসেছে কপিলের রূপ ধরে। চারদিকে শহরের মানুষের নানা অকথা কুকথা অনাদর-কথা শুনে শুনে ঘুমটিওয়ালা বরং এখন আরো নিশ্চিত যে কপিল আসলে তার হাগুড়া ব্যাটাই। কিন্তু এখন তার সেই বিশ্বাসের মানসে ঘোর একটা পরিবর্তন ঘটার সঞ্চরণ সে লক্ষ করে ওঠে। পরিষ্কার নীল আকাশে জ্যৈষ্ঠের হঠাৎ কালো মেঘ যেন দ্রুত ঘন ধেয়ে আসতে থাকে।

কপিল তার সেই ব্যাটা হাগুড়াই বটে, তবে ভাত হাতে মা যে তার পেছন পেছন একদিন দৌড়েছিল, মায়ের ডাক শোনে নাই, সেই ডাক তাকে মৃত্যুর পরেও খুঁজে ফিরেছে, সেই টানে সে ফিরে আসে নাই। ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নিতে— কেন তার মা তার জন্যে মাছের ব্যঞ্জন জোগাড় করতে পারে নাই! ক্ষুধার কাছে জননী বলে ভেদ নাই। আমি ক্ষুধার্ত, আমি পঞ্চব্যঞ্জনে ভোজন করব, আমাকে আহার দাও। যদি না দিতে পার তবে তোমার মৃত্যু আছে আমার হাতে।

কিন্তু হাগুড়ার জননী তো রেলের চাকার নিচে জীবন বিসর্জন দিয়ে সেই অপারগতার শোধ দিয়ে গেছে। সন্তানের চাহিদা পূরণ না করার জগতভাঙা দুঃখে রেলের চাকার নিচে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কাটা পড়া থেঁতলানো ঠোঁটে তার তখনো যে ছিল 'ফিরি আয়, বাপো মোর' শব্দধ্বনির আর্ত স্তম্ভিত বিস্ফারণ। তাতেও কি হাগুড়ার আত্মা শান্ত হয় নাই?

কপিল এখন যুবক। বালকের মতো ভাবের গতি এখন আর তত সরল নয় তার। এখন সে ক্রোধ বোঝে, মায়াও বোঝে। এ দুই যদি বালকেও বোঝে, তবে ঠাট্টা পরিহাস সে বোঝে বয়স হলে। কপিল পরিহাস করে বলে, না, মোর নাম কপিল নয়।

আমূল চমকে ওঠে ঘুমটিওয়ালা। প্রতিধ্বনি গড়িয়ে পড়ে, নয়?

পরিহাসের মাত্রা চড়িয়ে দিয়ে কপিল বলে, নয়, নয়। কপিল মোর নাম নয়!

তবে তুই কোন্?

কেনে? তোমারে সেই ব্যাটা। মোহাম্মদ হাগুড়া!

হ্যাঁ রে, মানুষ কি মরিলে ফির ঘুরি আসে?

আসিবার নয় কেনে?

মসজিদের ইমাম সায়েবে যে কয়, এ জেবন গেইলে আর নয়।

পরিহাসের মাত্রা চড়িয়ে কপিল তখন বলে, আর কালীবাড়ির ঠাকুরে কী কয়, শোনেন নাই? মরি গেইলেও কোনো কোনো মানুষ মরে না। ভুত হয়া ফিরি আসে। গাছের ডালে পাও ঝুলেয়া বসি থাকে। আন্ধার রাইতে পথিকের ঘাড় ভাঙি চিৎ করিয়া ফেলি রাখে।

ঘুমটিওয়ালা শিউরে ওঠে, কোনো কোনো ভুত তো মাছ খেতে চায়। গভীর রাতে হাটফেরত মানুষের হাতে মাছ দেখে পেছন ধরে ভুত। ওলটানো লম্বা লম্বা পায়ে পথিকের পেছনে পাথার ভেঙে ছোটে আর খোনা গলায় বলতে থাকে, মাঁছ খাঁমো, মাঁছ! মাঁছটা দিঁয়া যাঁ রে, মাঁছটা হাঁমাঁক দিঁয়া যাঁ।

ঘুমটিওয়ালার স্মরণ হয়, তার ব্যাটা হাগুড়াও তো মাছ খেতে চেয়েছিল! সেই মাছের বাঞ্ছাতেই সেদিন সে ভাত খায় নাই। তবে কি হাগুড়াই মাছের তরাসে ভুত হয়ে ফিরে এসেছে তার কাছে? তার কাছেই তো! টাউনে এত মানুষ থাকতে কপিল তার কাছেই বা এসে উঠবে কেন, যদি না সে হাগুড়ার ভুত হয়!

কাছারির মাঠে অর্জুনদা'র চায়ের দোকানে বসে আমরা কপিলের মুখে গল্প শুনছি। আমরা ভুত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভুতের ভয় পাই। ভুত নাই সত্ত্বেও লাশকাটা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার কালে গা আমাদের ছমছম করে। মানুষকে দেখি তারা সন্তানদের ভুতের গল্প বলে। শিশুরা মানুষের মতো জ্যান্ত বোধে ভুতকে গ্রহণ করে। অতএব, আমাদের হেসে ওঠা ঠিক নয় ঘুমটিওয়ালার ভয় পাওয়ার কথা কপিলের মুখে শুনে। তাছাড়া কপিল কখনো সত্য ছাড়া কথা বলে না। মাছখেকো ভুত না হয় বিশ্বাস না করলাম, ঘুমটিওয়ালার ভয়টা আমরা সত্য বলে গণনা করি।

কপিল হঠাৎ লক্ষ করে ঘুমটিওয়ালার ভীত ত্রস্ত সেই চোখ দুটি। এই প্রথম সেখানে ভয় দেখে ওঠে সে। ঠিক তক্ষুনি ট্রেনের হুইসিল শোনা যায়। সেই তীব্রস্বর কতকালের চেনা, তবু আজ হুইসিল শুনে চমকে ছিটকে পড়ে ঘুমটিওয়ালা। যেন জীবনের ওপারে মৃত্যুর প্রান্তর থেকে অশান্ত কোনো আত্মার চিৎকার সাপের জিহ্বার মতো লকলক করে উঠে মিলিয়ে যায়।

কপিল এর আগে কখনো ঘুমটিওয়ালার চোখে ভয় দেখে নাই। দেখেছে সে দুধের মতো মায়া, জলের মতো কোমলতা। মানুষটার চোখ দুটিতে আলো যেন কপিলকে ঘিরে প্রজাপতির মতো উড়েছে।

আর আজ সেখানে ভয়!

জলেশ্বরীর মানুষ তাকে এখন কত মন্দ চোখে দেখে। এই একজন এক মুহূর্তের জন্যেও মন্দ তাকে দেখে নাই কখনো। শনি বলে বিবেচনা করে নাই, যেমন শহরের মানুষেরা করেছে। আচমকা দেখা হলে পথের ওপর, দুষ্ট জ্বীন বলে তার পথ থেকে তৎক্ষণাৎ সরে যায় নাই, যেমন শহরের মানুষেরা কেউ কেউ এখন তাকে দেখলেই।

কপিলের মনটাই খারাপ হয়ে যায়। ভেতর থেকে শেকড় উপড়ে যায় তার।

ঘুমটিওয়ালা বলে, ভাত রান্ধিছি, দ্যাখ। আর বাইগনের ভত্তা।

ঘুমটিওয়ালা ভাতের পাতিলের ওপর থেকে ঢাকনা সরায়। ভকভক করে গরম ধোঁয়া ওঠে। ভাতের গন্ধে ঘুমটির আঙিনা মাতাল হয়ে পড়ে। কপিল মুখ ফিরে রাখে।

আয়, খা। বাপো মোর, ভুখ নাগিছে না?

না!

এই প্রথম তার মুখে ক্ষুধা লাগে নাই শুনে বিস্মিত হয় ঘুমটিওয়ালা।

ভাতের গন্ধ নিভু হয়ে আসে। বাঁশবনে সরসর আওয়াজ ওঠে। কুকুরটা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। ভাতের গন্ধ সে পেয়েছে। দরোজার কাছে কুকুরটা এসে মুখ তুলে একবার কেঁউ করে আওয়াজ করে। তারপর চৌকাঠ জুড়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়ে।

কুকুরটাকে ডিঙিয়ে একটা লাফ দেয় কপিল। তারপর ট্রেনে উঠে পড়ে।

ট্রেন তাকে নিয়ে জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যায়। এনজিনের চোঙ থেকে কালো বাষ্প ভকভক করে ওঠে। চাকার নিচে শাদা বাষ্প হিসহিস করে বেরুতে থাকে। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যায় হুইসিল। চকচকে রেলের পাটির ওপর দিয়ে লোহার গাড়ি যেন মানুষের স্বর ধরে চাকায় চাকায় বলতে বলতে যায়— যাই, যাচ্ছি, যাই, যাচ্ছি, যাই গো।

পাঁচ

কোথায় যায়! কতদূরেই বা যায়! নাকি ঘানির জীবের মতো খুঁটির চারপাশেই পাক খায় জীবন পথের পথিক? গভীরে হয়তো তাই। কোথাও সে যায় না। ঘানির খুঁটির মতো মানুষের নাভিও মাটির নির্দিষ্ট এক বিন্দুতে পোঁতা। ঘানির ঘূর্ণনে নিষিক্ত হয় তেল, মানুষের ঘূর্ণনে অভিজ্ঞতা।

কেউ বলে, নদী ছুটে যায়। কিন্তু নদী কোথাও যায় না। নদীর জল শ্রান্তিহীন বহে যায়, পলকহীন চলে যায়, নিমেষহীন যেতেই থাকে। কিন্তু নদী থাকে তার নিজের খাতেই। নদীর খাতটাই নদী, জল মোটে নদী নয়। জলে শুধু খনিত হয় খাদ। জলের ওইটুকুই কাজ। মানুষের চলার কাজও তাই। চলমানতায় সে মানুষ রূপে রচিত হয়।

সূর্য ওঠেও না, ডোবেও না। পৃথিবী আপন অক্ষে ঘূর্ণন করে বলেই দিবসের শেষে সূর্য কোথাও চলে যায় বলে আমাদের ভ্রম হয়। তবে ওই ঘূর্ণনের কারণে পৃথিবীতে কখনো আলো লাগে, কখনো অন্ধকার তার গায়ে থসথস করে পড়ে। আলোর প্রতীক্ষা করে মানুষ। মানুষের প্রতীক্ষা করে মানুষ। অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চায় মানুষ। এ কাহিনীর অন্তস্তলে আমরা দেখি ঘুমটিওয়ালা প্রতীক্ষা

করে কপিলের প্রত্যাবর্তনের।

ঘুমটিওয়ালা বৃদ্ধ হতে হতে নুয়ে পড়ে। চোখে তার ছানি পড়ে যায়। যে মাটি থেকে জন্ম সেই মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে নুয়ে নুয়ে চলে। কুকুরটা তার পেছন পেছন ঘোরে। কে বলে মানুষের মনেই শুধু মায়া আছে ? দিনের পর দিন ট্রেন আসে। সকালের ট্রেন। রাতের ট্রেন। এনজিনের চোঙে কালো বাষ্প, চাকায় চাকায় শাদা বাষ্প হসহস হিসহিস করে নির্গত হয়। বছরের পর বছর। একদিন তার প্রাণবায়ুটিও নির্গত হয়।

তখন ডালিম গাছে অপরূপ একটি ডালিম ধরেছিল। তখন সে ডালিমের গায়ে ন্যাকড়া বেঁধে পাখিদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করার জন্যে সে আর ছিল না। কিন্তু পাখিরা ডালিমের গায়ে ঠোকর দেয় নাই। ডালিমের দেহ ফেটে লাল দানা ঠিকরে পড়ে। রাজার হাতে আঙটির পাথরের মতো লালরক্ত বরণ তার জ্বলজ্বল করে। রক্ত পড়ে মাটিতে। ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে।

তারপর কপিল একদিন ফিরে আসবে। আমাদের এই কাল কবেই গতকাল হয়ে যাবে। আমরাও বৃদ্ধ হয়ে যাব। হয়তোবা মঙ্গা আর নাই, হয়তোবা বাংলার বুক তখন শ্মশান আর নয়। হয়তোবা তখন এই ট্রেনও আর নাই, এই রেললাইন নাই, এই ঘুমটিঘর নাই। সড়কে তখন নতুন যান। জলেশ্বরীতে তখন নতুন দিন। ইতিহাস তার অক্ষে ঘূর্ণন করতে করতে আলোকসম্পাতের ভেতরে তখন। আমরাও তখন আর নাই।

কিন্তু সেসকল কত পরের কথা। কত রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়বে। ফোঁটা ক্রমে অনর্গল হবে। মাটি ভিজতে ভিজতে মাটি ওই রক্ত শোষণ করবার ক্ষমতা হারাবে। রক্তে তখন মাটি ভেসে যাবে। একদিন একাত্তরেও তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্তে মাটি ভেসে গিয়েছিল। মহিউদ্দিনের রক্ত ফোঁটাও সেই ধারায় ছিল। বঙ্গবন্ধুর বুকের রক্ত যখন পড়ে, তখন অতিবিলম্বে অতিধীরে তাঁর রক্তফোঁটা মাটির ওপরে প্রবহমান রক্তের মহাধারাটিতে একবার ছলকে উঠেছিল, যেন অকস্মাৎ একটি রক্তপদ্ম মাথা তুলে উঠেছিল।

পদ্ম যদি জলের আলো, তবে বঙ্গবন্ধু রক্তভেজা ইতিহাসের ওপরে সম্পাতিত এক আলো। কোনো কোনো মানুষ মৃত্যুর পরেও জীবনের অধিক জীবিত থেকে যায়। সূর্যের আলো তো ফিরে আসেই। সেই আলো যদি এসেছে তবে সেই আলোয় নিশ্চয় তখন সর্বাঙ্গের ভস্ম আমাদের উত্তরপুরুষদের চোখে পড়ে। তখন তারা গাহনের জলে তাকে ধুয়ে, চেতনাই তো গাহনের জল বটে মানুষের, মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এ সকল আমাদের জীবনের কথা নয়। আমরা তখন নাই। তাতে কোনো দুঃখ নাই। ইতিহাসকে নিজের জীবনকাল দিয়ে মাপা যায় না।

কপিলও আবার ফিরে আসবে। কপিলের জন্যে যেন দুঃখ না করি আমরা। বরং কপিলকে আমরা লক্ষ করি। ওই তাকে দেখা যায় ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে। সে লাফিয়ে নামে কেন ? ট্রেনের তলায় হাগুড়ার মতো, হাগুড়ার মায়ের মতো সেও কি জীবন দিতে চায় ? তবে বুঝি পূর্বজন্মে সে ঘুমটিওয়ালার ব্যাটা হাগুড়াই ছিল। এ জীবনেও ভাতের থেকে মুখ ফিরিয়ে সে ট্রেনের চাকা লক্ষ করে লাফ দেয়।

না, সে লাফ দেয় প্রাণ দিতে নয়, প্রাণ বাঁচাতে।

বিনা টিকেটের একটা মানুষ চেকারের তাড়া খেয়েছিল।

শালার ব্যাটা শালা। রেলকোম্পানি তোর শ্বশুর হয় রে! মাগনা টেরেনে চড়িছিস ?

এই ধমক কপিলের ভাগ্যেও জুটতে পারত। কিন্তু চেকার তাকে কিছু বলে নাই। কারণ রেলের কর্মচারী ঘুমটিওয়ালার পালক ব্যাটা বলে তাকে সে জানে। তাই কপিলের কাছে টিকেট সে চায় নাই। কিন্তু তারপরও আইন বলে কথা। চেকার তাই চোখের ভুরু খানিক কুটিল করে বলেছিল, কোন্‌ঠে যাবু রে, কপিল ? জংশনের ওপারে গেইলে কিন্তু টিকিট লাগিবে। কপিল হ্যাঁ-না মাথা নাড়ে নাই। জংশনের এপার ওপার তার কাছে ধুলার মতো অন্ধকার। কোথায় তার গন্তব্য কিছু ভাবা নাই।

ওদিকে, চেকারের শাসন-তাড়া খেয়ে মানুষটা ততক্ষণে ট্রেনের কামরা ছেড়ে বাইরের হাতল ধরে ঝুলে পড়েছে। তার ধারণা ট্রেনের বাইরে ঝুলে থাকলেই টিকেট আর লাগবে না। সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে ট্রেন। চোখের পলকে সরে সরে যাচ্ছে বিল, মাঠ, টেলিগ্রাফের খুঁটি। গুমগুম করে শব্দ উঠছে চাকায় চাকায়। এনজিনের কালো বাষ্পের ভেতরে কয়লার গুঁড়ো উড়ে আসছে পেছন পানে। মানুষটার চোখ বাষ্পে আর গুঁড়োয় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, করকর করছে চোখের ভেতরে।

মানুষটা মিনতি করতে থাকে, এই পরের ইস্টিশানেই নামি যামো গো।

মিনতির স্বরও তার ঠিকমতো ফোটে না। অনাহারী বুঝি কতকাল। অনাহারীর স্বর শুনলেই চেনা যায়। ক্ষুধার কামড় সে ভালো করেই জানে। ক্ষুধার মানুষ শক্ত আওয়াজে চিৎকার যদি করতে পারত, তবে ভাতের অভাব তার হতো না। ভাত সে ছিনিয়ে নিয়ে খেত। কিন্তু অনাহারীর প্রথমেই যা চুরি যায়, সে তার গলার আওয়াজ। তবু যে ক্ষীণ আওয়াজ বেরোয় মানুষটার গলা থেকে, কপিলের কান খাড়া হয়ে ওঠে শুনে।

অনাহারীর দেহের শক্তিও চুরি যায়। বিস্ফারিত চোখে কপিল দেখে মানুষটার হাত থরথর করে কাঁপছে। মুষ্ঠি তার শিথিল হয়ে যায় কি অকস্মাৎ খুলেই যায়। মানুষটা ধপ করে পড়ে যায় ছুটন্ত ট্রেনের হাতলছাড়া হয়ে। কপিল তখন লাফ দেয়।

লাফ দিয়ে যেখানে সে পড়ে, তার অনেক পেছনে মানুষটা। লাফের চোটে কপিলের পা মচকে যায়। তবু সে উঠে দাঁড়ায়। গোড়ালিতে দারুণ যন্ত্রণা সত্বেও সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে মানুষটার কাছে যায়। মানুষ মানুষের কাছে গেলেও মানুষকে সবসময় পায় না। মানুষটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। মানুষ নয়, তার দেহটা পড়ে আছে রেললাইনের ধারে কন্টিকারির কাঁটার ঝোপে। প্রাণ তার নাই।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দেখে সে। তারপর মানুষটার হাত পা নেড়ে দেখে সে। সাড় নাই। বুকে কান পাতে। ধুকধুকি নাই। তখন সে মানুষটার হাত লতার মতো ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে জন্তুর গোঙানি চিৎকার করে ওঠে। তারপর নিজেও সে জ্ঞান হারায়।

কপিল বলে, জাগিয়া উঠি দ্যাখো এক অচিন ঘরে মুঁই। মাটির পরে খেজুরের পাটি। তার উপরে খ্যাতা। সেই খ্যাতার পরে মুঁই শুতি আছোঁ। মোর মুখের পরে মুখ ঝুঁকি আছে কয়জন। কালাকিষ্টি চেহারা। মোর চোখ মেলা দেখিয়া তারা কয়, আল্লা বাঁচাইছে। মুঁই পুছ করোঁ, আর সেই মানুষটা ? তারা কয়, সে চিন্তা তোমার নয়। মানুষ মরিলে যার দুয়ারে মরে দায়িত্ব হয় তার। তাকে দাফন দেওয়া হইছে। আল্লাকে শুকুর দ্যান তোমার জান বাঁচিছে। তার বাদে পুছ করে, কোন্‌ দ্যাশের মানুষ তোমরা ? মুঁই পালটা পুছ করোঁ, তোমার এই দ্যাশ কোন্‌ দ্যাশ ?

মানুষের দেশ তো একটাই— যেখানে তার নাড়ি পোঁতা। আবার কেউ কেউ বলে, দেশ হলো সেটাই যেখান থেকে মানুষ পৃথিবীর পথে যাত্রা করে। তারাই আবার বলে, তবে সেই যাত্রার পথ ঘুরে আসে তার নিজ দেশেই, সেখানে সে অন্তিমের মাটি পায়। আল্লা যদি সাগরতলের মাটি তুলে কাউকে সৃজন করে, তবে সাগরেই সে ফিরে যায়। হস্তী যে পর্বতে তার জন্ম, তবে তার লাশ কেন আধকোশার

উন্মত্ত ঢলে একদিন ভাসতে ভাসতে দূর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের চরে এসে আটকে যাবে, সেখানেই তার লয় হবে, যদি না ওই সমতল চরের মাটিতেই তাকে সৃজন করা না হয়?

কপিলের বিশ্বাস আল্লা তাকে জলেশ্বরীর পাশে বুড়িরচরের মাটি তুলে সৃজন করেছেন, বুড়িরচরেই অন্তিমে সে ফিরে যাবে। তবে তার আগে পায়ের তলায় পথ আছে। পথ আছে বলেই পায়েরও সৃজন। নইলে সাপের মতো বুক টেনে চলার ইতিহাস হতো মানুষের। গর্তে থাকার লিখনই হতো তার নিয়তি।

অতএব অচিন দেশেও কপিল মোটে চঞ্চল হয়ে পড়ে না। যেখানেই পা সেখানেই মাটি, যেখানে মাটি সেখানেই দেশ। তবে আর অস্থিরতা কিসে? জখমের পায়ে পাতা বেটে কাপড় বেঁধে দিয়েছে এখানকার মানুষেরা। বুনো পাতার ঝাঁঝালো গন্ধ কপিলকে আবিল করে রাখে। গভীর আরাম বোধ হয়। ভরসা জাগে। নিশ্চিন্তে সে চোখ বোঁজে। কানে পশে মানুষগুলোর আওয়াজ, ভাতের থালায় মাছির গুঞ্জনের মতো। বুঝি তার মধ্যে নারীও একজন আছে।

সেই নারী বলে, বাপজান, জ্বর আসিছে মানুষটার। দ্যাখেন না সর্বাঙ্গ থরথর করি কাঁপে।

নারীটির কণ্ঠস্বর শীতল জলপট্টির মতো তার কপালে পড়ে বোধ হয়। কিম্বা তার হাতখানাই। অন্ধকারে জ্যোৎস্নার আলো ফুটতে থাকে। কপিল পাশ ফিরে শোয়। তার পাশ ফেরার কারণে হাতখানা সরে যায় কপাল থেকে। তখন সে আনমনে হাতখানা খোঁজ করে। হাতের নাগালে পায় অচিরে। ব্যগ্র হয়ে হাতখানা সে চেপে ধরে নিজের কপালে। আবার সে জ্ঞানহারা হয়ে যায়।

কপিল টের পায় ক্রমে, অন্য এক ক্ষুধা পাক দিয়ে উঠছে তার নাড়িতে। ভাতের ক্ষুধা নয়, ভোজনের ক্ষুধা নয়, অচিন এই ক্ষুধা। এই ক্ষুধাকে সে চেনে না। কিন্তু ক্ষুধাটির লক্ষ্য সে বোঝে। সেই নারীর দিক থেকে চোখ তার ফেরে না। ঘরের ভেতরে আসে যায় নারী। যুবতী নারী। ছিপছিপে শরীরের নারী। ছিন্ন খাটো শাড়ি থেকে শরীরের আশ্চর্য এক জোয়ার ভেসে পড়ে। জগতের ছবি অদৃশ্য হয়ে যায়। যুবতীর ছবি জগত জুড়ে থাকে।

ব্যঞ্জনের পাতিলের তলার মতো ঘন কালো চেহারাটি তার। সেই কালোর ওপরে পিছলে পিছলে পড়ে রোদের আলো। পাকা জামের মতো টসটস করে। চোখের তারায় তার খঞ্জনা পাখির চঞ্চলতা। দেহ বেয়ে তরঙ্গ ঝরে। ঘরের ভেতরে যখন আসে তখন ঘর আলো হয়ে যায়। যখন ফিরে যায় ঘর নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে যায় কপিলের কাছে। কপিল এই রহস্যের ভেদ করে উঠতে পারে না। তার শরীরের ভেতরে অচিন ক্ষুধা লকলক করে ওঠে।

এখানকার মানুষগুলো ঘোর কালো। মাথার চুল ঈষৎ কোঁকড়ানো। হাবশীর রক্ত যেন শরীরে তাদের, কিন্তু হাবশীর মতো পাহাড়প্রমাণ দেহ নয়। বেঁটে তারা। তাদের এই গ্রামটির নাম মোগলডেরা। গ্রাম বলাও ঠিক নয়, মাত্রই কয়েক ঘর মানুষের বাস এখানে। মানুষও তাদের বলা যায় কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। নিজের জমিজমা নাই। নদীর ওপারে সম্পন্ন জোতদার বসুনিয়াদের মাঠে তারা কিষান খাটে। নদীর বুকে কলার ভেলা। নিত্য সেই ভেলায় তারা নদী পার হয়ে মাঠের কাজে যায়। নদীও কি তাকে বলা যায়? খাল! তাই বুঝি নামটিও তার কুণ্ঠিত কোমল— সুতলি নদী। দিন আনে দিন খায়। ভোটের জন্যে কেউ কখনো তাদের কাছে আসে নাই। তারাও কখনো মোগলডেরা থেকে এক ক্রোশ দূরের অধিক যায় নাই। অথচ রক্তসূত্রে তারা বহু দূরদেশের বলেই অনুমিত হতে পারে।

কবে কোন্‌কালে আসামের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেছিল মোগল সেনাপতি। ঘোর বর্ষার জন্যে অগ্রসর হতে পারে নাই। এখানেই ডেরা গেড়ে অপেক্ষা করছিল। বর্ষায় তাদের বারুদ ভিজে গিয়েছিল। আমাশয় রোগে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। মশার কামড় জ্বরে একে একে মারা যাচ্ছিল সিপাহিরা। সেই সিপাহির দলে হাবশীরাও ছিল বলে আমরা অনুমান করি। তাদের কেউ কেউ আর মোগল সেনাপতির সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে যায় না, এখানেই বসত করে বলে আমরা শুনেছি। অথবা এমনও হতে পারে, আমাশয় আর মশার কামড় জ্বরে তারা এতটাই মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল যে তাদের ফেলে রেখেই তাঁবু গুটিয়ে চলে যায় মোগলবাহিনী। অনুমান করি, পরিত্যক্ত সেই গুটিকয় হাবশীরই বংশধর এরা। আহত অচেতন কপিলকে এরাই রেললাইনের ধার থেকে তুলে আনে।

আমাদের দেশে এই এক সৌন্দর্য ধারণা আছে, যার গায়ের রঙ গোরা নয়, মানুষের জাতে সে নয়। আমাদের সমাজে এই এক সৌষ্ঠব ধারণা আছে, লম্বাচওড়া দেহ যার নয়, মানুষের জাতে অবনত তার স্থান। তাই কালোকৃষ্ণ মানুষ চায় গৌরবর্ণ ধারণ করতে, বামনখর্ব মানুষ চায় তালগাছের মতো দীর্ঘ হতে। আল্লা যে জন্ম দিয়েছেন, তার তো আর চিকিৎসা নাই, বামনখর্ব কালোকৃষ্ণ দেহ নিয়েই মাটির তলে যেতে হবে।

মোগলডেরার লোকেরা সেই নিয়তি থেকে মুক্তির একটা উপায় দেখে ওঠে কপিলের ভেতরে। এর সঙ্গে যদি ঘরের কন্যা ফতুনের বিবাহ দেয়া যায়, তবে সন্তান হবে গৌরবর্ণ, দীর্ঘও নিশ্চয় হবে সন্তানদের দেহ।

কিন্তু লোকটি এখনো মুখ খোলে নাই। নাম একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল।

নামখানা কী হয় তোমার?

কপিল।

কপিল নাম শুনে নির্ণয় করা যায় নাই হিন্দু কি মুসলমান।

বাড়ি কোন্‌ঠে?

অনির্দিষ্ট একটা দিকে হাত তুলে দেখায় কপিল। ব্যাথায় কাতর চোখ বোঁজে সে।

বাপের নাম?

আচ্ছন্ন গলায় কপিল উচ্চারণ করে, স্মরণ নাই।

কন কী! বাপের নাম স্মরণ নাই তোমার!

লোকেরা সন্দেহ করে ওঠে, বাপের নাম স্মরণে আছে ঠিকই, বলছে না শুধু জাতপরিচয়টা প্রকাশ পাবে বলে।

গোড়ালির ব্যাথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে কপিল। তাকে আর জিগ্যেসাবাদ করাও যাচ্ছে না। কপিলের গোড়ালির ক্ষতি মচকানোর অধিক, হাড়টাই নড়ে গেছে। দু'দিনে সুস্থ হবার কথা। মাসাবধি কালেও সুস্থ সে হয় না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে যায়, উত্তর দেয় না। কিন্তু গৌরবর্ণ বংশধারা রচনার এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

কপিলকে ঘোর ঘুমন্ত দেখে বৃদ্ধ একজন ফোকলা দাঁতের ভেতর থেকে খ্যালখ্যাল করে বলে ওঠে, কাপড় তুলি তার চ্যাটখানা দ্যাখো না কেনে? তবে না বুঝা যাইবে হিন্দু কি মোছলমান!

দেখা গেল, মুসলমানই বটে! তবে আর কথা কী! শেকড়ছাড়া মানুষ। বসত করালেই বসত করবে। আল্লার তরফ থেকে পাঠানো এই লোকটির রক্ত ক্রমে প্রবাহিত হবে এই জনগোষ্ঠিতে। ফর্সা এবং দীর্ঘ মানুষে ভরে যাবে মোগলডেরা। তখন আর মোগলডেরার মানুষকে কালো বলে কেউ হেলা করবে না। বেঁটে বলেও পরিহাস করবে না। এখন যে গরীবের গরীব তারা, তাদের সেই গরীবিও হয়তো রাতারাতি দূর হয়ে যাবে ফর্সা রঙের কারণে।

এরপর থেকে তারা দলে দলে কপিলের কাছে আসে। খেজুরপাটির ওপর শুয়ে আছে

ধন্দ লাগা মানুষের মতো। নীরবে তারা তাকে ঘিরে তার পানে চেয়ে বসে থাকে। নিজেদের ভেতরে নীরবেই কী কথা হয়, অকস্মাৎ দ্রুত উঠে যায় যেন জরুরি কোনো শলাপরামর্শ আছে। কপিল লক্ষ করে সবই। আড়চোখে সে মানুষগুলোকে দেখে। কিন্তু তার সরল চোখ সন্ধান করে ফেরে যুবতীকে। কিছুদিন থেকে যুবতী আর তার কাছে আসে না। যুবতী তাকে এড়িয়ে চলে। হাড়ভাঙা গোড়ালি নিয়ে সে বেশিদূর হাঁটতে পারে না। লেবুগাছের নিচে বসে থাকে। লেবুর গন্ধের ভেতরেও সে যুবতীর ঘ্রাণ পায়।

মোগলডেরার এই মানুষেরা শলাপরামর্শ অধিক আর করে না।

একদিন বাড়ির বৃদ্ধ এসে কপিলের পাশে বসে। একথা সেকথার পর বৃদ্ধ হঠাৎ এক কথার উত্থপনা করে বলে, একখান কথা, বাহে। তোমার যখন কেহ নাই, পিছনবাগেও টান নাই, তবে হামার মুল্লুকেই থাকি যান না কেনে ?

যেন নিতান্তই হেলাচ্ছলে কথাটা বলা। বৃদ্ধ স্খলিত হাসিতে মুখ ঝলমলে করে রাখে। কিন্তু মনের ভেতরে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে কপিলের উত্তর কী হয় শোনার জন্যে।

অনেকক্ষণ পরে কপিল উদাসস্বরে প্রতিধ্বনি করে, থাকি যামো ?

উৎসাহ পাবার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। বুনো বলদ একবার যখন দড়ির ফাঁস গলায় পড়েছে, ফাঁসটাকে শক্ত করবার জন্যে বৃদ্ধ তখন কপিলের জন্যে স্বর্গছবি আঁকতে শুরু করে দেয়।

সোৎসাহে বৃদ্ধ সত্যমিথ্যা বলে চলে, থাকি যান তবে। গরীবের দ্যাশ, গরীবের সংসার বলিয়া অধীর না হন। দুইবেলা গোলামের মতো খাটিয়াও ঠিক মতোন আহার জোটে না, সত্য। তবে হামার গাভিন আছে, দুধ দ্যায়। আমজাম কাঁঠালের গাছ আছে, ডাল ভাঙিয়া ফল ধরে। তাল ধরে গোটা গোটা। নদী আছে, মাছও মেলে। কচু মানকচু তো দিগন্ত ভরি লকলক করে। পাটখ্যাতের পাটশাক আছে। চাউলের বন্দোবস্ত গতর খাটিয়া। তা তোমাকে খাটিতেও হইবে না। খাটিলে ফতুন খাটিবে। ফতুন হামার নাতিন হয়। তাকে তোমরা শাদী করেন।

কথাটা শুনেই ধড়মর করে উঠে বসে কপিল। লেবুর গন্ধ হঠাৎ প্রবল হয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। সেই কালো চিকন শরীরের ফতুন নাই ধারেকাছেও। বিবাহের কথা যখন হয় কন্যা তো লুকিয়েই থাকে। গন্ধে কপিল মাতাল হয়ে ওঠে। অচিন অদ্ভুত সেই নতুন তার ক্ষুধা এবার বুঝি নিবৃত্তির দিকদিশা দেখতে পায়। ক্ষুধাটার আগুন তার শরীর-দক্ষিণকে দহন করতে থাকে লকলকে শিখায়।

কপিল বলে, ফলের বৃক্ষে ফল ধরে ?

হয়, হয়।

গাভিনে দুধ দেয় ?

হয়, হয়। পান করিয়া ভোর হয়া যাইবেন।

মাছ ?

পুঁটি খলসিয়া বুকরঙি গড়াই চ্যাং বিস্তর। কপালের জোরে রুইমাছও বিরল নয়।

কপিল জিজ্ঞাসা করে চলে বটে, কিন্তু নিজেই সে অবাক হয়ে যায় দেখে যে মন তার খাদ্যসন্ধানে নাই। লেবুর গন্ধ ছাড়া আর কিছুতে এখন তার চেতন নাই। ঘোরলাগা গলায় সে বলে, তবে তোমরা যা কন, মোর আর কোনো কথা নাই।

পরের শুক্রবারেই কপিলকে এসে কলমা পড়িয়ে যান সুতলি নদীর ওপারে বসুনিয়াদের বাড়ির মসজিদের মোল্লাসাহেব। যার কালো চিকন শরীরে দিনের রোদ ঝলকে ঝলকে পিছলে পড়ে, পূর্ণিমার রাতে সেই ফতুন তার বিছানায় এসে গোল হয়ে বসে। সেই খেজুর পাটির বিছানার ওপরে নকশিকাঁথা এখন। কন্যার এই দিনের জন্যে কবে জননীরা এই কাঁথা সীবন করেছিল, এতদিন তোলা ছিল ঘরের মাথায় বাঁশের বাতার ওপরে, আজ নামানো হয়েছে। সেই কাঁথারই বা কী সুঘ্রাণ! সবুজ বাঁশের, দীর্ঘ বছরের, দীর্ঘ অপেক্ষার ঘ্রাণ। পূর্ণিমার আলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে চিরল চিকন হয়ে এসে পড়েছে, যেন নকশিকাঁথার মতো পূর্ণিমাও এক নকশি রচনা করে তুলেছে।

বুভুক্ষু হয়ে ওঠে কপিল। অচিন ক্ষুধায় তার জগত ভেঙে যায়।

বিবাহের কারণে মোরগ জবাই হয়েছিল। লংকা যেমন লাল, তেমনি ঝাল। ঝালে লালে মোরগের রান-থান আহারের আগে চোখের দেখাতেই আকুলিত করে, নাকের নাল ঝরায়। কলাইয়ের ডাল রান্না হয়েছিল থকথকে করে। আর, ভানা ধানের লাল গরম ভাত। বাড়ির গাভিনের দুধে আখের গুড়ের পায়েস। ভোজনের এমন আয়োজন, তবু কপিল এই প্রথম ভাতের থালায় হামলে পড়ে নাই। নিজেই সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, ভোজনে তার আকর্ষণ আজ নাই। ক্ষুধা আছে, কিন্তু সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি এই সকলে সে দেখে নাই। লেবুর সেই গন্ধ ছাড়া তার কাছে আর কোনো গন্ধ নাই।

ফতুনের বুকের কাপড় একটানে ছিঁড়ে ফেলে সে।

আর্ত অস্থির ফতুন ফিসফিস করে ওঠে, আউ, আউ, কী করেন!

কপিলের মুখে কথা নাই।

কপিলের হাতে সমর্পিত ফতুন মিনতি করে, আস্তে করেন।

লেবুর গাছে লেবু হয় গোটা গোটা, বুকের লেবু এতবড় হয়! গাছের লেবুতে হাত বসে না এমন শক্ত লেবু, বুকের লেবু টিপে ধরলেই আঙুল বসে যায় তলতল করে! বোঁটা কামড়ে ধরে কপিল। দাঁতের কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চায় লেবু দুটো। টক তো নয়! নুন নোনতা! লবণ ছাড়া তো জীবনের স্বাদ নাই। লবণ তবে এত মধুর হয়!

আর কোথায় লবণ আছে মানবদেহে ? কপিল উন্মাদ হয়ে ওঠে। বিয়ের নতুন শাড়ি ফতুনের জন্যে রাজারহাট থেকে কিনে আনা হয়েছিল। নাইলনের লাল শাড়ি। সেই শাড়ি কপিলের দিশাবেদিশা হাতের টানে নিলাজ খসে পড়ে। শাড়িটাকে ছুড়ে ফেলে দেয় কপিল কি শাড়িটা মিলনের পাখা পেয়ে নিজেই উড়ে যায় পড়ে যায় দূরে। মেঝের ওপর পূর্ণিমার চিরল আলোয় শাড়িটাকে দেখায় চিত্রিত শঙ্খচূড় সাপের ছলমের মতো।

ফতুনের নবীন দেহের শাখাপ্রশাখাগহ্বরে কপিল লবণ সন্ধান করে উথালপাথাল। কোথাও স্থির হয় না। পূর্ণিমার চাঁদ গগন ঠেলে বৃহৎ হতে থাকে। কপিলের মুখ ভেসে যায় জ্যোৎস্নার লবণ-ধারায়। তবু পেট ভরে না। পেটের দক্ষিণের ক্ষুধা তার মেটে না। তখন সে দুয়ার ভেঙে প্রবিষ্ট হয়। জ্যোৎস্নার আলো ঈষৎ রক্তে গোলাপি হয়ে যায়।

আর তখনই কপিল তার রক্তের ভেতরে অচিন ওই ক্ষুধাটিকে চিনে ওঠে। যে ক্ষুধা তাকে জ্বলন্ত করে রেখেছিল, সেই ক্ষুধার আগুনে ঝলকে ঝলকে এখন তার দেহের পানি পড়ে। তবে সে আগুন নেভে। তবে সে লবণে, আর কিছুতে নয় শুধু সেই লবণে, সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি আসে তার।

কিন্তু এ ক্ষুধা তার পুরনো সেইপরিচিত ক্ষুধার মতোই যে, তাও সে আবিষ্কার করে। এই ক্ষুধা মেটে তো আবার ক্ষুধা লকলক করে ওঠে। আবার আগুন তপ্ত করে তাকে। আবার সে দেহের পানি ঝরিয়ে আগুনটাকে নেভায়। আবার জ্বলে ওঠে।

দিনরাত্রি এক হয়ে যায়। কপিলের বিরাম নাই। ফতুনেরও রেহাই নাই। দিনমান ফতুন বাপচাচার সঙ্গে মাঠে কাজ করে। সেই যখন কালো তাগা থেকে শাদা সুতা আলাদা করা যায় কি যায় না সেই গহন ভোরে সুতলি নদীর ভেলা ঠেলে ওপারে যায় মাঠে, তারপর কারবালার

হোসেনের রক্তভেজা আকাশটা যখন আর্ত বেগুনি হয়ে আসে ফিরে আসে। কপিল বাড়িতেই থাকে। সেই রকমই তো কথা ছিল— তাকে কোনো কাজ করতে হবে না। কাজও সে কখনোই কিছু শেখে নাই, করে নাই। কাজের মধ্যে একটাই সে জানে— ঘুমটির ওপরে শেকল তোলা আর সবুজ নিশান দেখিয়ে ট্রেন পাস করা। সে কবেকার কথা। এখন সে এ বাড়ির বংশধারা ফর্সা এবং দীর্ঘ করার শ্রমপুরুষ। এ বাড়ির মানুষেরা তার এই শ্রমকেই যথেষ্ট বলে মনে করে। গাভিনের দুধ সবটাই তার জন্যে। ব্যঞ্জনের অধিকাংশই তার পাতে পড়ে। ভাতের হাঁড়িও তার জন্যেই প্রথমে। কিন্তু আহারে তার আগের মতো দস্যুতা নাই।

মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বেরোয় সে। বেশিদূর যায় না। আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে। একটা শুকনো ভাঙা ডাল হাতে নিয়ে বুনো ঝোপের ভেতর দিয়ে আনমনা খানিক হাঁটে। সপাং সপাং বাড়ি মারে ঝোপের লতাপাতায়। পাতা থেঁতলে যায়। থেঁতলে যাওয়া লতাপাতার হঠাৎ কোনো একটা গন্ধ তাকে খানিক উন্মন করে তোলে। বুকের মধ্যে কী একটা ঝড় ওঠে মুহূর্তের জন্যে, বুড়িরচরের কথা মনে পড়ে যায়। তখন সে দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে আসে। ঘরের মধ্যে হামা দিয়ে ফতুনের জন্যে তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত সে অপেক্ষা করে। চোখ তার ফতুনের সন্ধান করে। ছায়া নড়লেও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, ওই বুঝি ফতুন! ঝাঁপ ঠেলে সে দুয়ারে এসে দাঁড়ায়।

সুতলির পানাপড়া বুকে ভেলা ঠেলে দুপুরে নিত্য একবার বাড়ি আসে ফতুন। ভাত নিতে আসে। এসে পাকঘরে যাবারও অবসর পায় না। উঠানে পা দিতে না দিতেই কপিল তাকে ঘরের ভেতরে হিড়হিড় করে টেনে নেয়। বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মতো নিঃসাড় ফতুন ঝোলে। একদিনও রেহাই নাই। পেটভরে ভাত খেয়েও কপিলের যে ক্ষুধা মেটে না।

দাপাদাপি করে ফতুন।

আহ, কী করেন! মাঠে ভাত নিয়া যাওয়া লাগে। বাপচাচা না খায়া বসি আছে খাবে বলিয়া।

রাখ, তোর ভাত! তার আগে তোর গরম ফ্যান খায়া দেখি!

দিনে তো এই, রাত্রিকালে তো কথাই নাই। রাত ঘন হতে না হতেই এই এক কথা তার মুখে, নিন্দে মোর চোখ ভাঙি আসে! ভালো করে খায় কি খায় না, ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর ধপ করে পড়ে। যাবার কালে ডাক দেয়, কিসের নিন্দ! আয় তুই!

রাত কিছু ঘন না হতেই, আকাশের তারা আকাশ থেকে মাঠের ওপর আরো ঝুঁকে পড়তে না পড়তেই, পথিকেরা ঘরে ফিরেছে কি ফেরে নাই, মাঠ ভেঙে শেয়ালের চলাচল শুরু না হতেই, ফতুনকে তার ঘরে চাই।

দ্যাখো! দ্যাখো! শরম নাই।

শরম নাই তো চ্যাটখানা মোর কাপড় তুলি তোর দাদায় দেখিছিলো ক্যানে ?

আউ, আউ, ছী ছিয়া!

ফতুন বিলম্ব করে। তারও যে ঘরে যেতে সাধ যায় না, এমন তো নয়! দাদির দিকে আড়চোখে দেখে। দাদি খলখল করে হাসে। ফতুনের মনে হয়, কপিলের অস্থিরতা দেখে বুড়ি হাসে। কিন্তু না, বুড়ি এমনিতেই হাসে। জগতের ধারা দেখে সকলেই কাঁদে। কেউ কেউ খলখল করে হাসে।

ফতুন ঘরে আসে। কপিলের তর সহ্য নাই। ঝাঁপিয়ে পড়ে। একবার, দুইবার, তিনবার, তারও অধিক কোনো কোনো রাতে। তাতেও কি শান্তি ? অধিকবারের পরেও মাদুরের ওপর চিৎ অবসন্ন হয়ে পড়ে ফতুনকে সপাটে জাপটে ধরে কপিল বলে, তৃষ্ণা তবু যায় না রে কেনে, ফতুন ?

তৃষ্ণা! ক্ষুধা তবে নয়! তৃষ্ণা! এই এক নতুন শব্দ কপিলের ভেতরে কিছুদিন থেকে উপস্থিত হয়েছে। শব্দটা এতদিন ছিল কোথায় ? শব্দ থাকে মানুষেরই আত্মার ভেতরে। শব্দই সরব হয়ে ফুটে বেরোয় মানুষের নতুন কোনো বোধের তীব্র চাপে। জন্মযন্ত্রণার মতোই তীব্র সে চাপ।

ক্ষুধা তো ফতুনেরও ছিল। ক্ষুধাই কি! নাকি তৃষ্ণা। কপিলের পানি সে পান করে তৃষ্ণার্ত উন্মুখ তার দক্ষিণের বিস্ফারিত ঠোঁটে। লজ্জাই নারীকে শোভা পায়, এ যদি জন্ম থেকে জানে সে, তবে সেও এতদিনে জেনে যায় ওই লজ্জা শোভা শুধু নয়, ওই লজ্জা স্বামীর শয়নে উড়ে যায়। দাদিনানিজননীর অবিরাম জলসেচে লজ্জার যে লতাগাছ বাল্য থেকে বেড়ে ওঠে নারীকে ঘিরে, সেই লতাটিকে যখন স্বামীর জান্তব হাত উপড়ে ফেলে, দেহ তখন দেহলবণের ধারায় ভেসে যায়। কী যে সুখ তাতে! উনোনের পরে মাংস যেন টগবগ করে উথলায়। ক্ষুধায় ভেঙে যেতে থাকে শরীর। ফতুনও এখন দিবস নাই, রাত্রি নাই, শরীর-মাংসের সেই আহার চায়। ক্ষুধা তারও মেটে না। তৃষ্ণা তার তবু যায় না।

মোগলডেরার হাবশীরক্তের বামন খর্ব মানুষেরা অপেক্ষা করে। এ তো আর ম্যাচের কাঠি নয় যে শলা ঘষিলাম কি অগ্নি ধরি উঠিলো! জন্মকথায় ধৈরজ ধরা লাগে হে। একদিন সেই ধৈর্যের অবসান হয় তাদের। মাঠ থেকে ফিরে দাদিকে খলখল করে হাসতে দেখে তারা। বুড়ির হাসি যে আর থামে না।

আরে, অ্যাতো হাসেন কেনে ? বুড়াকালে তোমাক কি জিনে ধরিছে!

দাদি বলে, ফল ধরিছে!

ফল!

হাততালি দিয়ে বুড়িবেটি বলতেই থাকে, ফল ধরিছে! ফল ধরিছে!

নারী তবে বৃক্ষ আর ফল তার সন্তান! আর অধিক বলতে হয় না, বাড়ির পুরুষেরা ফুল্ল হয়ে ওঠে, শিমুল গাছের পত্রহীন ডাল লাল ফুলে ছেয়ে যায় অকস্মাৎ। কোলে কোলে তারা পূর্ণিমার মতো ফর্সা ধবধবে এক শিশুকে দোল খেতে দেখে ওঠে। আনন্দে বিহ্বল তারা হাতের ছেনি, দা, লাঙল, লাঠি, দড়ি ছুড়ে ফেলে ফতুনের তালাশ করে। কৃষি তো শুধু মাঠে নয়! মানবশরীরেও কৃষি আছে।

বাপের কণ্ঠ বাড়ির আনাচেকানাচে ঘোরে, কইরে মা, কোন্‌ঠে রে তুই!

বুড়ি দাদি বলে, এইবার চান্দের টুকরা আসমান হতে আঙিনায় নামি আইসবে।

দাদাবুড়োর কথার বিরাম নাই। গর্ভকালের মাস পরে মাস দিন পরে দিন অবিরাম সে বলে চলে, মুঁই স্বপন দেখিছিনু হে, ফেরেশতা হামার দুয়ারে আসি খাড়া। ধবধবা চেহারাখানা তার। সর্বশরীরে জ্যোতি। হাতে রুপার এক খাঞ্চা। সেই খাঞ্চার উপরে হাত পাও আসমানের দিকে তুলি বাচ্চা শুতি আছে। শিমুলের ফুলে আচ্ছাদন হয়া আছে। শিমুলেরে মতোনে রাঙা মুখখানা তার। হামাকে দেখিয়াই খলখল করি হাসি উঠি হাতের মুষ্ঠি লীলা করি কয়— দাদা হে! তোমার ঘরে আসিলোম।

ফতুনের গর্ভকালেও কপিলের বিরাম নাই। ফতুনের নাভি যত ঠেলে ওঠে, ততই আড়াল হয়ে যেতে থাকে দেশ, ততই ব্যাকুল হয়ে দেশ সন্ধান করে কপিল। ফতুনের তিরস্কারও ক্রমেই তত কঠিন হয়ে পড়ে।

আহ! করেন কী তোমরা! বাচ্চার আঘাত লাগিবে!

কপিল বিমর্ষ হয়ে পড়ে। যেন এক রাজ্য ছিল তার, হঠাৎ সে সর্বহারা আজ। ফতুন তখন কপিলের হাত সন্ধান করে ফুলে ওঠা পেটের ওপর রাখে।

দ্যাখেন, এইখানে হয় বাচ্চার পাও, এই যে খোঁচা মারি আছে! আর এই দ্যাখেন পাশ ফিরিলো বাচ্চা।

অ্যাতো তুই ক্যামনে জানিলি ? মোর আগেও কি প্যাট করিছিলি ?

ফতুন ক্রুদ্ধ হয়ে ঠেলা দিয়ে স্বামীকে সরিয়ে দিয়ে বলে, ও কী কথা কন! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর ঘন নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর বুকে আলগোছে হাত রাখে সে। পালোট খেয়ে স্বামীর গালে গাল ঘষে বলে, তোমাকে ছাড়া আর কোনো পুরুষ মুঁই চেনো নাই। আসেন যদি, আস্তে আসেন। বাচ্চা না টের পায়। আরামে আসেন।

নিজের বস্ত্র সন্তর্পণে নিজেই সরিয়ে ফতুন অপেক্ষা করে। কিন্তু কোনো সঞ্চরণ নাই কপিলের। ফতুন তখন স্বামীর নাভিতে হাত রাখে। সেই হাতখানা কপিল আনমনা তুলে নাড়াচাড়া করে। ফতুন জানে না, কপিল এখন গর্ভের সন্তানের বিষয়ে চিন্তা করে। একদিন সেও ছিল এমনই এক জননীর গর্ভে। জননীর কথা তার মনে পড়ে।

কপিল আমাদের বলে, ভাইরে ভাই, অকস্মাৎ মায়ের কথা তখন খুব মনে পড়িতো মোর। চক্ষে ছবি দেখি উঠিতোম, মাও হামার হাঁটিতে হাঁটিতে দূর হতে দূরান্তে চলি যায়। যায় কেবল যায়, তবু না চক্ষের আড়াল হয়া যায়। মোর দিকে তাঁই পিছন ফেরা। মুখখানা না দেখা যায় তার। চক্ষে তখন পানি আসি যাইতো। মাও মাও বলিয়া কান্দি উঠিতোম।

সন্তানের মা হয় ফতুন।

সেদিনও সে সুতলি নদীর ভেলা ঠেলে মাঠে গিয়েছিল বাপচাচার সঙ্গে ধানের কাজ করতে। ধানকাটার মৌসুম। এত ধান, মাঠ যেন ধানের সাগর। মোগলডেরার কিষান কামলায় এত ধান ঘরে তোলা সম্ভব নয়। বসুনিয়ারা দূরান্ত থেকে আলগা কিষানের দল এনেছে। যে যত ধান কাটতে পারবে তার হিসাবে সে ততটা মজুরি পাবে।

ফতুনের কাজ ধানের আঁটি বসুনিয়ার আঙিনায় এনে রাখা। ফতুন যদি ঘরে বসে থাকে, তবে একজনের খোরাকি পরিমাণ কমে যাবে। একজন তো সে আর নয়, এখন তার স্বামী আছে। তারও আহার আছে। ভরাগর্ভ নিয়েই ফতুন মাঠে গিয়েছিল। হঠাৎ তার ব্যাথা ওঠে। নাভির নিচে অকস্মাৎ যেন ছুরির পোঁচ। তবু সে কাজে ক্ষান্ত দেয় নাই। কিন্তু আর কতক্ষণ ? একসময় সে ধানের পুষ্ট শিষের

সাগরে টাল খেয়ে পড়ে আসন্ন প্রসবের তীব্র যন্ত্রণায়।

ভরদুপুরের তপ্ত আকাশের নিচে ধানের মাঠেই সন্তান তার মাতৃজলের সাঁতার ভেঙে বেরোয়। ধান, সেই ধান, ক্ষুধার আহার, ধানের সাগরে মাতৃগর্ভ থেকেই নিষ্ক্রান্ত হয় শিশু। নুয়ে পড়া পাকা ধানের সাগরে সন্তান তার হাবুডুবু খায়।

আমরা ব্যগ্র হয়ে কপিলকে জিগ্যেস করি, ব্যাটা হয় না বেটি ?

ব্যাটা! ফতুনের দাদি যে কইছিলো চান্দের টুকরা, সেই চান্দের টুকরাখানাই পয়দা হয়। ফতুনের দাদা যে কইছিলো, রুপার খাঞ্চায় বাচ্চা, সেই কথাটা কিন্তুক খাটে নাই। পাকা ধানের বরণ তো রুপার বরণ নয়, তার সোনার বরণ, ধানের সাগরে ধানের সেই সোনার খাঞ্চায় বাচ্চা আসে ফতুনের।

আমরা ভুলি নাই, একটু আগেই সে বলেছিল, গর্ভকালে ফতুনকে একবার সে প্রশ্ন করেছিল, তুই কি আগেও কোনো সন্তান ধরেছিলি গর্ভে ? সেই সন্দেহটা কি তবে তার মাথা থেকে যায় নাই ? সেজন্যেই কি ফতুনের বাচ্চা সে বলে ? নির্ণয় করবার জন্যে কপিলকে আমরা তাড়া দিই, এ কেমন কথা! কেবল ফতুনের বাচ্চা ক্যানে ? তোমারও কি নয় ?

প্রায় উন্মাদ এক দিশেহারা মানুষ এখন ভাঙা বয়সের এই কপিল। তা সত্ত্বেও তার বোধবুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই। আমাদের কথাটার ধারা সে বুঝতে পারে। বলে, সে-কথা নয় হে, সে-কথা নয়। পুরুষ বলিয়া কথা। নারী গর্ভবতী হইলেও পুরুষ তাকে না চায়া করে কী! নারী যে বাধা দেয়, তাতেই মুঁই রাগঝাগ করি কথাটা কইছিনু। শরীরের ইচ্ছায় বাধা পাইলে যে মাথায় খুন চড়ি যায় ব্যাটাছাওয়ার। সেই কথাটা না ধরেন তোমরা। তবে কথা কি জানেন, বাচ্চা যখন হয়া যায়, বাচ্চাকে দেখিয়াই মোর মন উথাল হয়ে ওঠে।

তৎক্ষণাৎ আমরা ধারণা করে উঠি, শিশুর মুখ দেখেই কপিলের মনে স্নেহমায়া জেগে ওঠে। পিতার পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এরপরেই কপিল যা বলে আমরা মর্মমূলে চমকে উঠি।

কপিল বলে, হাহাকার করি ওঠে হামার মন। এই কি হামার সৃজন ?

কেন ? বাচ্চা কি সুন্দর হয় নাই ? কাকের মতো কালাকিষ্টি হয়েছিলো তবে ? হাহাকার কেন ?

পরের দিন, বিকাল কালে ঘরের ভিতরে পাও রাখিতেই দেখি, বাচ্চা কামড়িয়া ধরিছে ফতুনের বোঁটা। আক্ষসের মতোন চোঁও চোঁও করি টান দিচ্ছে। দাঁত তো নাই, তবু তার চোয়ালে কী জোর! কামড়ে কী শক্তি! যন্ত্রন্নায় কাতর ফতুন। তবু বাচ্চা বোঁটা ছাড়িবার নয়। অ্যাতো দুধ বুকে তার নাই। নাই তো নাই। অক্ত য্যান চুষি খাইবে! মুঁই দেখিয়াই বেদিশ।

গভীর মর্মার্থ নিয়ে কপিলের বাক্যগুলো ধীরে আমাদের ভেতরে উন্মোচিত হয়। কপিল তীরবিদ্ধ হয় দুশ্চিন্তায়। এই কি তার সৃজন ? এই শিশু ? শিশুর এই ক্ষুধা! সন্তান তবে নয়, সন্তানের আকারে ক্ষুধারই তবে জন্ম হয়েছে তার ঔরসে! কপিল তার নিজের সেই আদি ক্ষুধার কথা স্মরণ করে ওঠে। পুত্র যদি পিতার আদলেই গড়া, এই ক্ষুধাও তবে তারই ছাঁচে গড়া।

শিশুর এই ক্ষুধার সমুখে তার দ্বিতীয় ক্ষুধার কথা ভুলে যায়। নারীর শরীরে লেবুর সেই ঘ্রাণ ছাপিয়ে ভাতের গন্ধ বহুদিন পরে তার ওপরে আছড়ে পড়ে। কিন্তু ওই গন্ধ বা ঘ্রাণ কোনোটাই এখন তার নিজের পাওয়া করে নয়, জগতের ভেতরে করাল হাওয়ায় ভাসমান সে দেখতে পায়।

কপিল দূরত্ব অনুভব করে ওঠে— সন্তান থেকে, এমনকি তার নারী থেকেও অচিরে। নারী এখন গর্ভমুক্ত, নাভির নিচে দেশ এখন আবার দৃশ্যমান। নারীর হাত এখন বস্ত্রের গিঁটে। উন্মোচনের জন্যে প্রস্তুত। আকাঙ্ক্ষা করলেই ফাঁস খুলে যাবে।

সন্তান পাশে নিয়ে ফতুন অপেক্ষা করে। কত দীর্ঘ মাস স্বামীকে তার বঞ্চিত রাখতে হয়েছে। ফতুনের দেহ লেবু গন্ধময় হয়ে পড়ে থাকে। রাতের পর রাত স্বামীর কোনো সাড়া নাই দেখে সে একবার তার অঙ্গে হাত রাখে। ফিসফিস করে ওঠে, আসিলে তো আসিবার পারেন।

কপিল পাশ ফিরে শোয়।

পূর্ণিমার এক গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে কপিল। ফুলমনি তার মা এসেছে ঘরে। বিছানার পাশে। কপিলের পাশে। ওই দাঁড়িয়ে আছে। শরীর থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে জননীর। নাকি পূর্ণিমার আলোয় গাহন ঠেলে উঠেছে বলে জ্যোৎস্না অমন ঝরঝর করে ঝরছে ?

বিস্ময়ে কপিল থরথর করে বলে, মা, তুই!

কপিলমুনি মোর!

তুই না মোকে ছাড়িয়া কোন্ বা দেশে গেইছিলু ?

তার আগোতে তোর বাপ মোকে ছাড়িয়া যায়।

ক্যানে যায় ?

ভাতের কারণে যায়। ভাতের ক্ষুধা যে বিষম ক্ষুধা, কপিলমুনি।

তারে জন্যে তুইও কি মোকে ছাড়িয়া যাইস, মাও ?

তোকে ছাড়িয়া যাইতে যে কী কষ্ট, বুকে ছিদ্র হয়া আছে, কপিলমুনি মোর।

কপিলমুনি ডাক বাল্যকালে মায়ের মুখে শোনা ছিল। আড়ালে আবডালে পুরো নামটা ধরে ডাকত মা। ইমাম সাহেবের নিষেধ ছিল, মুনি ডাকা মুসলমানের ব্যাটার জন্যে ঠিক নয়। কপিল তো ভুলেই গিয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে জননীর বাঞ্ছা করা সেই নাম পুত্রের কাছে আবার ফিরে আসে।

কপিলমুনি!

হিন্দুর নামে ডাকেন, মসজিদের ইমামসায়েবে যদি কিছু কয়! যদি তোমার দোজখের আগুনে পুড়িতে হয়, মা!

দোজখের আগুন ক্ষুধার আগুনের কাছে শিমুল ফুলের বিছনা! হাসিতে হাসিতে দোজখের আগুনে যাওয়া যায়, ক্ষুধার আগুনে জগৎ জ্বলি ওঠে। সংসার ভস্ম হয়া যায়। মানুষ পাতাল হতে পাতালে চলি যায়। তোর বাপ মোকে ছাড়ি যায়।

আর না তুই মোকে ফেলেয়া যাইস, মা রে! যদি যাইস, এইবার তোর পাছে পাছে যামো।

ক্যানে রে ? হেথায় কোন্ দুঃখ তোর ?

দুঃখের অবধি নাই, কষ্টের অবধি নাই। চিন্তা করিয়াও তল না পাই, মা। জনম মরণের তল পাই না। আল্লা যদি সৃজনই করিছে, মরণ ক্যানে সৃজন করিছে তাঁই ? তুইও কি মরি গেইছিস ?

চমকে ওঠে কপিল। উত্তর নাই কেন জননীর মুখে ? ধড়মর করে সে উঠে বসে।

মা! কোন্ঠে তুই ?

কপিলের উদ্ভ্রান্ত চোখ জননীকে খোঁজে। এই তো ঘর, এখানেই ছিল। এই ছিল, এই নাই। স্পষ্ট শুনেছি স্বর, আর কেন শুনি না ?

কপিলের চোখ এসে স্থির হয় বিছানায়। কেমন অচেনা মনে হয়। পূর্ণিমার আলো এসে পড়েছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। চিরল আলোয় চিত্রিত হয়ে আছে ঘুমন্ত ফতুনের মুখ আর পাশে তার সন্তান। এই তার স্ত্রী ? এই তার পুত্র ? নিদ্রায় কি মানুষ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে ? দোজখের আগুনও কি এমন করেই তবে শিমুল ফুলের হয়ে ওঠে ?

সম্মোহিতের মতো কপিল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নির্নিমেষ চোখে অনেকক্ষণ সে

তাকিয়ে থাকে পূর্ণিমাচিত্রিত মুখ দুটির দিকে। হঠাৎ সে চোখ বিস্ফারিত হয়ে দেখে, শিশু থাবা তুলে জননীর স্তন আক্রমণ করল। দু'পায়ে আছাড় তুলে শিশু তার মুখ গুঁজে দিল স্তনে। দুগ্ধপানের চকাৎ চকাৎ শব্দ উঠতে লাগল। দূরে তক্ষুনি ডেকে উঠল ফেউ। পরেপরেই শেয়ালের হুক্কাহুয়া।

কপিল লাফ দিয়ে দরোজার ঝাঁপের কাছে সরে দাঁড়ায়। দু'চোখ ব্যপ্ত করে চোখের তারার তৃষ্ণায় সে দীর্ঘক্ষণ শোষণ করে ঘুমন্ত দুটি মুখচ্ছবি। শেয়াল বা ফেউ আর ডেকে ওঠে না। এমনই স্তব্ধতা এখন নিশীথে যে নক্ষত্রেরও দগ্ধ হবার শব্দ শোনা যাবে কান পাতলে।

সন্তর্পণে ঘরের ঝাঁপ খোলে কপিল। সন্তান ফেলে স্ত্রী ফেলে কপিল বেরিয়ে পড়ে। আঙিনায় এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ায়। না, এখানে লেবুর ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণ থেকে মুক্তি চাই তার। জগৎ ভেসে যায় জ্যোৎস্নায়। দ্রুত পায়ে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে কপিল হেঁটে চলে। প্রান্তর মাঠ নদী বৃক্ষ সরে সরে যেতে থাকে পেছনে আরো পেছনে। পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাবার আকর্ষণে ক্রমেই বিশাল ও রক্তাক্ত লাল হতে থাকে।

ছয়

কপিল হাঁটতে থাকে। কখনো জনপদের ভেতর দিয়ে, কখনো নির্জন প্রান্তর ভেঙে, কখনোবা ঘন বনের ভেতর দিয়ে সে হেঁটে যায়। রাত প্রভাত হয়, প্রভাত খর হয়ে ওঠে, দুপুরের সূর্য মাথার ওপরে আগুন ঢালে, আকাশ রক্তাক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে সন্ধ্যায়, রাত্রি গভীর হয়। কপিল হেঁটে চলে।

মাথার ভেতরে আকাশ নিয়ে সে হাঁটে। কখনো সেই আকাশে কাকের চিৎকার, চিৎকার করতে করতে উড়ে যায় শতসহস্র তারা, ফিরে আসে শাখা পাখার গাংচিল হয়ে। কখনো অরণ্য হয়ে যায় মাথার অভ্যন্তরে, সেখানে হুতোম প্যাঁচা ডেকে ওঠে অকস্মাৎ গম্ভীরস্বরে, কখনো এক ময়ূর অবতীর্ণ হয় তার বিস্তৃত পাখার রঞ্জন নিয়ে।

কপিল চিন্তা করে। জন্ম-মৃত্যু ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিষয়ে সে চিন্তা করে। মৃত্যু তাকে ভীত করে না। মৃত্যুর পরেও মানুষ ফিরে আসে। তার জননী ফুলমনি ফিরে এসেছে। স্পষ্ট সে তাকে দেখেছে পূর্ণিমার রাতে, ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। জ্যোৎস্নার জ্যোতি তার শরীরে। না, মৃত্যুকে তার ভয় নাই। মৃত্যু এমন যে ভিন দেশে যাওয়া, কিন্তু একদিন আবার ফিরে আসা।

ফিরে আসা ? কার কাছে ফিরে আসা ? সন্তানের কাছে! ফুলমনিও সন্তান তারই কাছে তো ফিরে এসেছিল। সন্তানের কথা মনে হতেই কপিল ভীত হয়ে পড়ে। তার মাই টানা সে দেখেছে। জন্ম তাকে উৎপীড়ন করে। জন্ম তো সে দিয়েছে। শিশু নয়, সন্তান নয়, রাক্ষস! ক্ষুধার রাক্ষসকেই সে জন্ম দিয়েছে। ক্ষুধাকে সে আজীবন চেনে। ক্ষুধার দাঁত কত তীক্ষ্ণ সে জানে। তার কামড় কতখানি কচ্ছপের মতো, তাও তার অবিদিত নয়।

ক্ষুধার দ্বিতীয় প্রকারও তার জানা হয়ে গেছে। নাভির দক্ষিণে সেই ক্ষুধাটি সাপের মতো বিড়ে পাকিয়ে থাকে বটে, মুহূর্তে সে জাগ্রত হয়, উন্মাদের মতো গর্ত সন্ধান করে। শীতেও শরীরে ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ে সেই ক্ষুধা। ভাতের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলে পরদিন মল নির্গত হয়। মাছি ওড়ে। নাভির দক্ষিণের ক্ষুধা মানবীর দ্বিতীয়দ্বার থেকে সন্তান নিষ্ক্রান্ত হয়। জননী চুমো খায়।

ক্ষুধার হাত থেকে সে মুক্তি চায়। কপিল পথ হাঁটে। একটি জীবন, একটি গ্রাম, একটি নারী, একটি সংসারের ফল দুধ ব্যঞ্জন সে ত্যাগ করে এসেছে, তবু তার অনাহারের ক্ষুধা পায়, নাভির দক্ষিণে সেই ক্ষুধাটিও তাকে ছোবল মারে, ছোবলের বিষে অবসন্ন হতে সাধ যায়। কিন্তু এ সকলই যেন অন্য কারো জীবনের কথা। তারই ভেতর থেকে তারই রূপ ধরে তার দ্বিতীয় সে তাকে অনুসরণ করে। কপিল তাকে দূর থেকে অবলোকন করে পথ হাঁটে। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে সে চলে। মাঠের পর মাঠ। অরণ্যের পর অরণ্য। নদীর পরে নদী।

কিন্তু দেহ বলে কথা! দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। দেহের ভেতরে দেহ চায় আহার। দেহ মৃত্যুকে ভয় পায়। দেহ বেঁচে থাকতে চায়। কপিল দেখে, বনের পাখি মাঠের ঘাসেও আহার পায়। মানুষের জন্যে ঘাসে আহার নাই। কপিল দেখে, নদীর মাছও নদীর পানি থেকে আহার পায়। কপিল আঁজলা ভরে পানি পান করে। ওতে ক্ষুধার আগুন সাময়িক নিভে যায় বটে, ফিরে আসে দ্বিগুণ তীব্র হয়ে। পানিতেও মানুষের আহার নাই। খাদ্যের ক্ষুধায় সে উন্মাদ হয়ে যায়। দিনের আলোতেও অমাবস্যা নেমে আসে। মাথার ভেতরে আকাশটা বিস্তৃত হতে হতে মাথাটাকেই ফানুষের মতো উড়িয়ে নিতে চায়। কপিল জোর করে মাটির ওপর পা চেপে রাখে। কপিল আর হাঁটতে পারে না।

সে একটি মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঠটি নির্জন নীরব নয়। গর্জন মুখরিত। সে দেখে, শতশত মানুষ সেখানে। শতশত মানুষ বসে আছে মাঠে। দূরে মঞ্চ পাতা। ফুলের ঝালরে সজ্জিত সেই মঞ্চ। সেখানে টুপিশোভিত একজন মানুষ দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে কী যেন বলছে। মানুষেরা শুনছে। হাত তাদের মোনাজাতের মতো মেলে ধরা। যেন মঞ্চের ওই মানুষটি কখন রাশি রাশি কী ছুড়ে দেবে, লুফে নেবার জন্যে হাত পেতে ধৈর্য ধরে তারা অপেক্ষা করছে।

আমরা অনুমান করি ভোটের সময় ছিল সেটি। রাজনৈতিক সভা হচ্ছিল জনপদটিতে। সভায় ধৈর্য ধরা শ্রোতারা অবশ্য সকল সময় শান্ত ছিল না। কপিল সভয়ে লক্ষ করে তারা মাঝে মাঝেই মারমুখী হয়ে আকাশের দিকে লাফ দিয়ে উঠছে। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে গগনভেদী আওয়াজ তুলছে। আবার নীরব হয়ে বসে পড়ছে আবার সেই হাত পেতে।

আমরা দেখেছি মঙ্গার দেশে আমাদের মানুষের হাত সমুখের দিকে জন্মগত পাতা থাকে, মেলে ধরা থাকে। মঙ্গার মানুষ হাত পেতে রাখে। যদি কিছু হাতে পড়ে, তবে কিছু মুখে দেবার জোগাড় হয়। হাতের ওই এক ব্যবহার ছাড়া মঙ্গার দেশে মানুষের আর কিছু জানা নাই।

দূর থেকে ধন্দলাগা চোখে কপিল তাকিয়ে থাকে। তারপর পায়ে পায়ে সে এগোয়। দেখতে দেখতে জনসভার নিকট প্রান্তে চলে আসে। তখন সে দেখতে পায়, শতশত মানুষ যে বসে আছে, তাদের প্রত্যেকের পায়ের ফাঁকে কাগজের একটা করে বাক্‌সো পড়ে আছে। শীর্ণ হাঁটুর ঘের দিয়ে রক্ষা করে আছে তারা বাক্‌সো। কী আছে ওই বাক্‌সে ?

এক যুবক কপিলকে হাঁক দিয়ে বলে, আইসো আইসো। দূরে ক্যানে, বাহে! ভিড়ি যাও। ঘন হয়া বসো।

বলতে বলতে টেবিল থেকে নিয়ে যুবক কপিলের হাতেও একটা বাক্‌সো ধরিয়ে দেয়।

তারপর কপিলের পিঠে ঠেলা দিয়ে যুবক তড়বড় নির্দেশ দেয়, অ্যালা চুপ করি বসিয়া মিটিং শোনো। এইবার ভোটে গরীবের বন্ধু নছরমিঞাকে জয়যুক্ত করায় হামার কাম। তাঁই তোমাকে এই বাক্‌সো দিছে। তার নামে জিন্দাবাদ দিবে!

কিন্তু সে-কথা কানে গেলে তো! ততক্ষণে কাগজের বাক্‌সের ভেতর থেকে ঘন ঘ্রাণ পেয়ে গেছে কপিল। গোশতো-ভাতের ঘ্রাণ। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুধা হিলহিল করে ওঠে তার। একটানে বাক্‌সের ডালা খুলে দেখতে পায় তেলজড়ানো ঘিয়ে রঙের ভাত, একটা দুটো দানা লাল রঙের, গোশতের একটা খণ্ড তার ওপরে। একপাশে আধখানা সেদ্ধ ডিম উপুড় হয়ে চাঁদের মতো শোভা পায়। আহারের এমন

শোভা কপিল আগে কখনো দেখে নাই।

বিস্ফারিত চোখে অপলক তাকিয়ে থাকে কপিল। ঘ্রাণটা তার পেটের ভেতরে আগুন জ্বালে। সঙ্গে সঙ্গে সে বসে পড়ে। বসেই বাক্সোর ভেতরে হাত ডুবিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে, মুখের ভেতরে গরাসে গরাসে চালান করে মুহূর্তে সব নিঃশেষ করে ফেলে।

ছোকরাটি হাঁ হাঁ করে ওঠে কাণ্ড দেখে, আরে! আরে! করেন কী! খানিক বাদেই মিছিল হইবে। মিছিলে যাইবেন। তারবাদে না খাইবেন!

দীর্ঘ একটা হাত লাঠির মতো ছুড়ে দিয়ে কপিল ধমকের স্বরে যুবককে বলে, আরো দ্যান! আরো একখান বাক্সো দ্যান!

যুবক তখন একটা লাথি কষিয়ে দেয় কপিলের কাঁখে। কেঁও করে উঠেই কপিল কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ে। লোকটাকে পতিত হতে দেখে যুবক সরোষে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। যুবকের অকস্মাৎ এই আক্রমণে মুহূর্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল কপিল। হুঁশ ফিরে আসতেই লাফিয়ে উঠে সে ছোকরার গলা টিপে ধরে।

শালার শালা! দে কইলোম! বাক্সো দে। দিবু না কেনে ? গরীবের বন্ধু হয় বলিলে! গরীবের বন্ধুর বাক্সো তুই দিবার নইস ক্যানে!

গোলমাল দেখে ঘুরে তাকায় অনেকে। মঞ্চের পেছন থেকে যুবক দু'তিনজন দৌড়ে আসে। কোনো সন্ধান তদন্ত নাই, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কপিলের ওপর। তার হাত থেকে যুবককে উদ্ধার করে। তারপর কপিলকে মারতে মারতে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় রাস্তার ওপারে। কপিলও তাদের শরীরে দমাদম ঘুষি লাথি চালায়।

মারের মুখেই হঠাৎ কপিলের নজর যায় টেবিলের দিকে। মঞ্চের পেছনে টেবিলের ওপর থরে থরে বাক্সো সাজানো। সেই বাক্সো। গোশতো-ভাতের বাক্সো। কপিল তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করে দেখে, কী তার কর্তব্য। শরীরে তার শক্তি আছে। এই চ্যাংড়া কটাকে সে একাই লাশ করে ফেলতে পারে। কিন্তু না। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বাক্সের পাহাড়ের ওপর। হাতের গোছে যে কটা বাক্সো ওঠে, বুকের কাছে চেপে ধরে দেয় সে দৌড়। মুহূর্তের মধ্যে সে জনসভার মাঠ পার হয়ে যায়। ঝোপঝাড় খাল বিল পার হয়ে তবে সে

□

এক নিরালা বনের ভেতরে এসে থামে।

আহার তবে কেড়ে নিতে হয়! এই এক নতুন কথা কপিলের মনে উদয় হয়। তার স্মরণ হয় না এর আগে কবে কার খাবার এমন করে কেড়ে এনেছিল সে। কপিল থমকে যায়। মানব জন্মের ওপর ক্রোধ হয় তার। ঘৃণা হয় নিজের ওপরে। ঘিনঘিন করে ওঠে সারা শরীর। গোগ্রাসে যা খেয়েছিল, হড়হড় করে বমি করে দেয় সে। বনের গাছ, গাছের পাতা ছিঁড়ে সে মুখ মুছে শুয়ে পড়ে গাছেরই গোড়ায়।

খাবারের বাক্সোগুলো ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে পাশে। একটা কাক এসে বসে। কাক তো নির্জন বনে থাকে না! খদ্যের গন্ধ পেয়ে গ্রাম থেকে কাক তবে আসে। মানুষও তো খাদ্যের গন্ধ শুঁকে শুঁকে মঙ্গার গ্রাম থেকে শহরে আসে। কাকের পেছনে আরো কাক আসে। বাক্সোগুলোর কাছে উড়াল দিয়ে নামে। চতুরের মতো চোখ তুলে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা বাক্সোগুলো দেখে, কপিলকে দেখে। কপিল এত কাছে, কিন্তু সে মূর্তির মতো স্থির শয়ান দেখে কাকেরা ঘনিয়ে আসে। নিকটে এসে স্থির হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ একসঙ্গে কাকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাক্সোগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। লুট শুরু হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম ঝোঁকের পরেই কাকগুলো আবার একসঙ্গে লাফ দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে নিরিখ করতে থাকে অন্নক্ষেত্রটি।

কাকগুলো দ্বিতীয়বার অগ্রসর হবার আগেই কুঁ কুঁ করে একটা কুকুর আসে বনের ভেতরে সরু পথ ঠেলে। অধীর নয়, ধীর পায়েই কুকুরটা এসে সোজা অন্নক্ষেত্রের ওপরে দাঁড়ায়। শুঁকে দেখে। থোত্না দিয়ে বাক্সো একটা ঠেলা দেয়। তার উদ্দেশ্য গোপন থাকে না কাকদের কাছে। সমস্বরে তারা কা-কা করে ওঠে। তীব্র কা-কা। যেন বলতে চায়, কুত্তাভাই, একায় সব খাইও না হে! হামরাও ভুখা আছি।

কপিলের মুখ স্মিত হয়ে ওঠে স্নেহের আলোয়। কপিলই তখন উঠে বসে বন্টন করে দেয় গোশতো-ভাত। খানিক সে কুকুরটার সমুখে ঠেলে দেয়, খানিক সে দূরে ছুড়ে মারে কাকদের জন্যে। নিঃশব্দে আরো একটি কুকুর আসে। সঙ্গে বাচ্চা তিনটে কুকুর। জননী এসেছে সন্তান নিয়ে। খাদ্যের গন্ধ পেয়ে খাদ্যের খোঁজে এসেছে সন্তানের যদি আহার জোটে।

কপিলের মন উদাস হয়ে যায়। তার মা ফুলমনি তো তাকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম ছাড়ে নাই! একাই সে যাত্রা করেছে। নিঃশব্দে সে যাত্রা করেছে। চোরের মতো পালিয়ে গেছে। কপিলের দিকে তো ফিরে দেখে নাই।

কপিলের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে।

মঙ্গার দ্যাশোতে কুত্তার মতো জীবন যদি, কুত্তার মতোন তবে মানুষের মায়া নাই ক্যানে!

ঘাসের ওপর কপিলের বমি পড়ে আছে। বাচ্চা কুকুর একটা হঠাৎ কপিলের বমির রাশে মুখ দেয়। আহা, এখনো বোধ হয় নাই তার! ভাত আর বমি চেনে না আলাদা করে! হামা দিয়ে কপিল নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে খপ করে বমি থেকে তুলে নেয়, তারপর বাক্সো থেকে আহার দিতে থাকে তাকে।

রাত্রিশেষে কপিল আবার যাত্রা করে। ক্ষুধাকে জয় করা চাই তার। যে ক্ষুধার জন্যে খাদ্য কাড়তে হয়, যে ক্ষুধার জন্যে জীবকে বমিতেও মুখ দিতে হয়, সেই ক্ষুধার দেহে পাথর মারো। আছড়াও তাকে। হত্যা করো।

ক্ষুধাকে হত্যা করে কপিল এখন দিনের পর দিন অনাহারে থাকে। কিন্তু দেখে ক্ষুধা রক্তবীজের ঝাড়। মরেও মরে না। আবার জন্ম নেয়। কিন্তু কেউ কোথাও নিশ্চয় সদয় হয়। নইলে বনের গাছে ফল ধরে কেন ? পাকা ফল পায়ের কাছে পড়ে থাকে কেন ? কোনো কোনো দীর্ঘ ঘাসের রস এত দুধের মতো হয় কেন তবে ? কেন সেই ঘাস বুনো পাথারে সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ? কার অপেক্ষা করে ? কপিলের জন্যেই কি ?

দীর্ঘ ঘাসের গুছি মাথা নেড়ে বলে, আহা, তোমারে জইন্যে হে! একবার ছিড়ি নিয়া মুখে দ্যাও, দাঁতে ধরি চাপ দ্যাও, মুখে তোমার দুধ ঢালি দেমো হে!

পথ চলার জন্যে শক্তি যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই কপিল এখন মুখে দেয়। ঘাস চিবিয়ে দুধ পান করে। বনের ফল ভোজন করে। এখন সে এটাও শিখে গেছে, দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা চেপে রাখলে ক্ষুধাও নমিত হয়ে পড়ে। সে উপবাসের রহস্য আবিষ্কার করে। উপবাস তাকে আরেক মানুষে পরিণত করে। নিজের ভেতরে এই নতুনের সম্ভাবনা এতদিন তার অগোচরে ছিল। সে মানুষের অতিরেকে এক মানুষ বোধ করে ওঠে নিজেকে। প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা সামান্য ওই পানভোজনে শরীর তার ঝরঝরে বোধ হয়। যেন লঘু হয়ে যায় সে। এতটাই লঘু যেন পাখির মতো উড়তে পারবে ইচ্ছে করলেই। কিন্তু মাটির মানুষ সে, মাটিতেই সে অগ্রসর হয়।

কপিল হাঁটে। বনপ্রান্তর সে পার হয়ে যায়। পার হয়ে যেতেই থাকে। চলায় তার বিরাম নাই। মাটিতেও যেন পা নয়, মাটির এক আঙুল ওপরে পা, ভেসে ভেসে যেন সে চলে। অমাবস্য-পূর্ণিমা পালা করে আসে, পালা শেষে ফিরে যায়। চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষীণ হয়, আবার সে পূর্ণ গোল হয়ে ওঠে। চাঁদ আকাশে ভাসে। লঘু দেহে কপিলও যেন ভাসে। চাঁদটিকে তার মায়ের মুখ বলে কখনো মনে হয়। সূর্য যখন গনগন করে আকাশে ওঠে, তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বুঝি অন্ধই হয়ে যাবে। জগৎ নিভে যাবে। সে চোখ বুঁজে পথ চলে। তার নির্ণয় হয় না কোথায় সে চলেছে।

একটি গ্রামে সে আসে। নাকি অবতীর্ণ হয়! একটি দিঘির ধারে নিজেকে সে দেখতে পায়। অনেক পথ চলেছে সে। বটের ঝুরির মতো ক্লান্তি নেমেছে শরীরে। একটি দিঘি সে দেখতে পায়। কালো জল। জলের ওপরে আলোর ঝিলিমিলি। জলপোকার সাঁতার। নির্জন নিস্তব্ধ চারদিক। ঘুঘুপাখির থেকে থেকে ডাক, যেন নির্জনতার শাড়িতে নক্শা বুনে চলে। শাড়িটি আরো মনোহর হয়ে উঠছে। কপিল দিঘির কিনারে বসে পড়ে। গাছপালায় ঘন এদিকটা, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে বসে থাকে। রাত হয়, ভোর হয়, বিকেল হয়ে আসে। দিঘির জল শান্ত। বাতাস মৃদু। নির্জনতা গভীর। আকাশের উজ্জ্বলতা এখন ম্লানিমার দিকে। তখন দিঘির জলে ঢেউ ওঠে। কলকলাৎ করে শব্দ হয়। কপিল দৃষ্টিপাত করে।

মাছ! জলের মাছ! না, মাছ তো নয়। দিঘির কালো জল ঠেলে রুপালি মাছের মতো এক যুবতী তার উপরাঙ্গ নিয়ে জলে ভেসে আছে। জল তাকে ঈষৎ তাড়না করছে। যুবতীর দেহ ঢেউয়ের মৃদু তাড়নায় ভেসে যেতে চায়, যুবতী জলবৃত্তের ভেতরে নিজেকে আবার ফিরে আনে। দেহ সে মাঞ্জন করে। জলে মন্থন করে কেশ। ডুব দেয়। যেন জলতলে সে ফিরে যায়। সেখানেই তার দেশ। জলের ওপর বৃত্ত ক্রমে বিস্তৃত হতে হতে পাড়ের মাটিতে নিলীন হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ আলোড়িত হয় জল। জল ঠেলে যুবতী আবার দেখা দেয়। এবার নাভি পর্যন্ত জাগরিত হয় তার দেহ। বুকের ফল থেকে জল ঝরে। ফলযুগলের বোঁটা বস্ত্র ভেদ করে উদ্গ্রীবতায় প্রকাশ পায়।

কপিল এপার থেকে দেখছিল। যুবতী নাভি পর্যন্ত প্রকাশিত হতেই কপিল মেরুদণ্ড টান করে দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দু'পাশে বাহু দুটি তার সার্বভৌম হয়ে পড়েছিল, বিস্তারিত হয়েছিল যুবতীর দিকে।

যুবতী তাকে দেখে নাই। কপিলের উপস্থিতি যুবতী টের পায় নাই। যুবতী দিঘির পাড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে

একবার তাকিয়েছিল। তারপর ঘরের দিকে যাত্রা করেছিল। দিঘির ওপারে গাছগহীনের ভেতর দিয়ে পথ। অচিরে গাছের আড়ালে সে পড়ে যায়। যুবতীকে আর দেখা যায় নাই। কিন্তু তার নিতম্বের দোল কপিলের চোখে তখনো থামে নাই! জলে যে স্বচ্ছ হয়েছিল বস্ত্র, প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল নিতম্বের দুটি তাল, যুবতীর পিঠের কেশ তার মধ্যভাগে লম্বিত হয়েছিল, যেনবা পথিকের জন্যে পথের প্রতি তীরচিহ্ন সংকেত।

সম্মোহিতের মতো কপিল উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন সে যুবতীকে অনুসরণ করবে, সংকেত সে গ্রহণ করবে, কিন্তু চেতনা ফেরে তার, সে বসে পড়ে। গাছের মাথায় পাখি একটা কিটকিট কিটকিট শব্দ করে চুপ হয়ে যায়। পাখির সেই ডাকটিকে কপিলের কাছে বিদ্রুপের ধ্বনি বলে বোধ হয়।

কপিল নির্ণয় করে, তবে যে আরেক ক্ষুধার পরিচয় সে ফতুনের সাক্ষাতে পেয়েছিল, সেই ক্ষুধাকে এখনো সে জয় করতে পারে নাই। নিতম্ব সংকেত গ্রহণ করতে এখনো সে ত্বরায় প্রস্তুত। বুকের বোঁটা দংশনে এখনো ঠোঁট ব্যগ্র। দেহের লবণ সন্ধানে এখনো সে উন্মুখ। মাংসের ওপর মাংসের আছাড় এখনো তার হৃদপিণ্ডে থামে নাই।

কপিল বিষণ্ন হয়ে পড়ে। দেহ তার শিথিল হয়ে পড়ে। দেহ থেকে মুক্তি নাই। মুক্তি সে প্রার্থনা করে। সে চিন্তা করে। গভীর চিন্তায় সে ডুবে যায়। গাছের দীর্ঘশ্বাস ওঠে। কপিলের বুকে গাছের একটি দুটি পাতা এসে পড়ে। কপিল একটা উপায় দেখে ওঠে। প্রথম ক্ষুধাকে দমন করতে পারলে দ্বিতীয় তার ক্ষুধাও নিশ্চয় অবসন্ন হতে পারে।

দীর্ঘ উপবাসের ভেতরে নিজেকে সে নিক্ষেপ করে। বনের ফল গাছের পায়ের কাছে পড়ে অপেক্ষা করে। ফল পচে যায়, মাটিতে নিলীন হয়ে যায়। দুধের ঘাস শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে নুয়ে পড়ে মাটিতে। নদীর জল বহে যায়, সেখানেও কপিল আঁজলা ধরে না।

কিন্তু এই উপবাসেও চোখ তার জ্যোতি হারায় না। চোখ আরো উজ্জ্বলতা ধরে ওঠে। চোখ নতুন এক দূরগামীতা পায়। চোখ তার যুবতীর গৃহ পর্যন্ত পৌঁছোয়। সকলি সে চিত্রের মতো দেখে ওঠে। শরীর যত ক্ষীণ হয় কপিলের, ততই নিকট ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয় চিত্র। শ্রবণের কান তার এত দক্ষ হয়ে ওঠে যে যুবতীর নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ সে এখন শুনতে পায়। ঘ্রাণ পায়। দেহঘ্রাণ। লেবুর ঘ্রাণ। সেই ঘ্রাণ। ঘ্রাণের শক্তিও তার এতটাই তীব্রমান হয়ে পড়ে এখন।

স্পষ্ট সে দেখে ওঠে যুবতীকে। দিঘির জল ঠেলে যুবতী আসে। সেই ভেজা বস্ত্র তার। বস্ত্রের সেই জলস্বচ্ছতা। কপিলকে হাত বাড়াতে হয় না। যুবতী নিজেই তার বস্ত্র ফেলে নগ্ন হয়ে যায়। তার বুকের ফল দেহবৃক্ষে দেখে ওঠে কপিল। বৃষ্টিধোয়া গাছের গুঁড়ির মতো নিতম্ব তার, হাত রাখে কপিল। কিছুক্ষণ সেই সিক্ততা সে করতলে উপভোগ করে। সিক্ত কিন্তু আগুনের তাপ গভীরে। করতল তার উষ্ণ হয়ে পড়ে। যুবতীর নিঃশ্বাস ঘন থেকে ঘনতর হয়। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রতিযোগী হয়ে ওঠে কপিলের নিঃশ্বাস। তেজি ষাঁড়ের মাটি কাঁপানো দৌড়ের মতো ধ্বকধ্বক শব্দ করে তার হৃদপিণ্ড।

কালবিলম্ব না করে কপিল ঝাঁপিয়ে পড়ে ফলের বোঁটায় দংশন বসায়। লবণের স্বাদে ভরে যায় মুখ। নিচে আরো নিচে নামে সে। এত ব্যপ্ত এত দীর্ঘ হতে পারে দেহ ? সেই দেহে তার নামনের তল সে পায় না। অতল গহ্বরে পতিত হতে হতে মানুষ যেমন হাতের মুষ্ঠিতে কিছু ধরবার জন্যে খোঁজে, ঠেকাতে চায় পতন, তেমনি জীবন-ব্যগ্র হয়ে ওঠে তার হাত। তক্ষুনি হঠাৎ এক লবণজলের উষ্ণধারায় হাত তার ভিজে যায়। ঈষৎ উন্নত একটি সমতলখণ্ড তার করতলে ঠেকে। সমতলটিকে সমান্তরাল করে নিলেই হয়! তবেই রক্ষা। তবেই গন্তব্য। যুবতীকে সে আছাড় দিয়ে চিৎ করে মাটিতে। তারপর উষ্ণ পিচ্ছিল এক লবণধারার গহ্বরে সে অগ্নির শলাকা গুঁজে দেয়।

একবার, দুইবার, বারবার, ফিরে ফিরে অবিরাম। অগ্নি নিভে যেতে না যেতেই আবার জ্বলে ওঠে। লবণধারার ক্ষরণ শমিত হয় না। এত নিষ্পেষণেও যুবতীর বুকের ফল তলতল করে তবু। এত নিক্ষেপণেও তার নিতম্বের গুঁড়ি অটুট থাকে। এত নিপীড়নেও যুবতী শীৎকার-রহিত হয় না।

আছাড় মেরে চিত্রটাকে যদি ফেলে দেয়া যেত! আয়নার ছবির মতো ভেঙে যদি শতখণ্ড করা যেত! ঈশানের অকস্মাৎ মেঘ যদি দিনের আলো গ্রাস করে নিত!

না! চোখ থেকে চিত্র মোছে না কপিলের। সে পরাজিত বোধ করে। পেটের ক্ষুধাকে সে পরাজিত করতে পেরেছে। নাভি-দক্ষিণের ক্ষুধাকে সে এতটুকু কাবু করতে পারে নাই! উপবাসে যে এই ক্ষুধাটি আরো তীব্র হয়, দেখে সে বিস্মিত হয়ে পড়ে। দিঘির পাড় থেকে সে দ্রত পায়ে যাত্রা করে।

যুবতীর দিকে নয়, যুবতীর সন্ধানে নয়, লেবুগন্ধী যুবতীর গৃহের দিকে নয়। সে পলায়ন করে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় তার দৌড়। এতেও যদি নিস্তার পাওয়া যায় এই ক্ষুধা থেকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে এক জায়গায় এসে স্থির হয়। ধপ করে বসে পড়ে। কত ক্রোশ দৌড়েছে সে, প্রাণবায়ু যেন নিঃশেষিত হবার আগে শেষ খিঁচুনি তুলছে। হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে সে পড়ে থাকে। দমকে দমকে শ্বাসপ্রশ্বাসের চাপে পিঠ তার নদীস্রোতে শুশুকের মতো ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে।

তারপর নদী নিস্তরঙ্গ হয়। কপিল মাথা তোলে। কপিল চোখ তুলে দেখে মাঠে কোঁচামারা যুবকেরা খেলা করছে। আরেকদল যুবক, বুড়ো, বাচ্চা খাড়া হয়ে খেলা দেখছে। তালি দিচ্ছে। কলরব করে উৎসাহ দিচ্ছে। আবার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সমানে সমান পাল্লা দেখে, আবার তারা সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠছে খেলার একটা গতি দেখে।

কাবাডির খেলা শেষ হয়। কিন্তু খেলার ফলাফলে ঘোর অসন্তোষ দেখা যায়। পরাজিত প্রতিপক্ষ প্রতিবাদের রোষে লাল হয়ে ওঠে।

না! তোমরা চুরি কইরছেন খেলায়! হারিবার কথায় নয় হামার!

কিসের হারিবার নয়! গুহারা হারিছেন তোমরা। এলা রাগঝাগ করি শরম ঢাকিতে চান!

কিসের শরম ? চুরি কইরছেন তোমরা, তোমরা শরম করেন।

শালার শালা, জারুয়ার দল!

কী কইলেন ? জারুয়া ? বাপের ঠিক নাই হামার ? তবে রে!

বিষম মারপিট শুরু হয়ে যায় মাঠে। কপিলের ওপর দিয়ে দু'এক গড়ান খেয়ে যায় মার খাওয়া কোনো কোনো যুবক। দু'জন বুড়ো মানুষ মারামারির মধ্যে ঢুকে পড়ে থামাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এক বুড়োর পা একখানা খাটো। তুমুল তার ল্যাংচানি এখন দেখে কে! পাড়ার চ্যাংড়ারা নিশ্চয় তাকে নকল করে মজা পায়।

একদিকে ল্যাংচা বুড়োর লাফানো, তার মুখে নারীর মতো চিকন আওয়াজে, আরে! আরে! এইগুলা কী!

আরেকদিকে আরেক বুড়োর হাঁড়ি ফাটানো গলা, বাপো, বাপোগণ, থামেন

বাপো। কাজিয়া করা ঠিক নয়। কাজিয়া না করো, বাপোগণ।

এক বুড়োর বিষম আওয়াজে কি আরেক বুড়োর ল্যাংচানো নাচের ফলে, বিবদমান দুই দলের চেল্লাচেল্লি ধাওয়াধাওয়ি মারামারি ক্রমে থেমে আসে। কপিল খুব মজা পায়, বুড়ার কথার দাম তবে আছে অ্যালাও দুনিয়ায়। সে ঘনিয়ে বসে। কিন্তু গোলমাল থামলেও বিবাদের রোষ তখনো কমে নাই।

যুবকদের ভেতর থেকে আওয়াজ ওঠে, আইজ তবে হয়া যাউক ফয়সালা। কার পক্ষে কত শক্তি দ্যাখা যাউক।

বুড়ো দু'জন একটা সমাধান উপস্থিত করে।

বেশ! ভাল্ কথা! তোমার দলের একজন আর তোমার দলের একজন সামনে আইসো। কুস্তি হয়া যাউক। কুস্তিতে যাঁই ফেলেয়া দিতে পারিবে জয় হইবে সেই পক্ষের।

নারীকণ্ঠের ল্যাংচানো বুড়ো আঙুল তুলে ধরে বলে, কী! রাজি!

তামাশাটা ভালোই জমেছে। কপিল উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার চক্ষুস্থির হয়ে যায় দুই দলের বাছাই করা দুই যুবককে দেখে। একজন পাহাড়ের মতো। বাঘের মতো হাঁক পেড়ে সে মাঠে নামল। বিপরীতে অন্য দলের আরেকজন যে মাঠে নামল, দেহখানা তার ধানের শিষের মতো হিলহিলে। পাঁজরার হাড় ক'খানা গণা যায়।

কার হাতে বাঁশি ছিল, ফুউক করে বেজে ওঠে। কুস্তি শুরু হয়ে যায়। কুস্তি তো নয়, পাছড়াপাছড়ি বলা যায়। কাবাডির মতোই ধরপাকড়, প্যাঁচ কষা, মাটিতে ফেলা। কপিল ভেবেছিল, এক পাছড়াতেই হিলহিলে যুবকটা মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু যতবার তাকে বলবান যুবকটি আছাড় মারে, ততবারই সে স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উরুতে চাপড় মেরে বলে, আয়! আয়!

কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায় কপিল। তার চোখ হিলহিলে যুবকটির দিকে পড়ে থাকে। বিজলির মতো সে যুবক ঝিলিক দিয়ে ওঠে, মুখেও তার বিজলির মতো আওয়াজ, সড়াৎ সড়াৎ করে সরে যায়, কপাৎ কপাৎ করে বলবান যুবকের পায়ে লাথি মারে, বলবান যুবকের হাত পায়ের প্যাঁচে পড়েও হিলহিলে যুবকটি চোখের পলকে বিজলির মতো গগনে উঠে যায়, বলবান যুবকটির প্যাঁচ ব্যর্থ হয়। হতে থাকে।

তারপর অকস্মাৎ কলরব ফেটে পড়ে। ফুউক করে বাঁশি বাজে। কপিল বিস্মিত হয়ে দেখে, বলবান যুবকটি কোমরভাঙা হয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আর তার উরুর ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিলহিলে যুবকটি। জয় তারই হয়েছে।

কপিল হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে যায় সে জানে না। গ্রামের প্রান্তে কবেকার এক ভাঙা রাজবাড়ি। দেয়াল ভেদ করে বট অশত্থ উঠেছে। বাড়ির মুখে সারি সারি বিদেশী সুপারি গাছ ছিল। হাতির পায়ের মতো গোল তার গড়ন। শাদা চুনের মতো আস্তর। সব কটি মাথা ভেঙে ন্যাড়া হয়ে আছে। জানালা দরোজার কপাট ঝুলছে হাতির কানের মতো। পাশে এক মন্দির ছিল। মন্দিরে ঠাকুর নাই। মন্দিরের মাথা ত্রিশূলহারা। মন্দিরের দরোজা বুড়ো মানুষের ফোকলা দাঁতের মতো হাঁ করে আছে, যেন খলখল করে নিঃশব্দে হাসছে। রাজবাড়ির ভেতরে এখন আর রাজা নয় বাদুড় বাস করে।

রাজবাড়ির চত্বরে ঢোকার মুখে তোরণ ছিল। তোরণের মাথা এখন নাই। দু'পাশে গোল দুটি থামের ভগ্নাংশ। থামের ওপর পাথরের বাঘ দুটি ছিল, তার একটি লেজসমতে গোটা পেট হারিয়েছে, আরেকটির দেহই আর নাই, চারখানা পায়ের তিনটি মাত্র হাঁটুর নিচে এখনো পাথর আঁকড়ে আছে।

কপিল এসে রাজবাড়ির ভাঙা তোরণের নিচে স্থির হয়। কালপতিত বাঘ দুটিকে দেখে। থামের বেরিয়ে পড়া ইটের ওপর হাত রাখে। করতল ঘষে। করতলের নুনচামড়া উঠে যায়। করতল লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু জ্বালা বোধ হয় না তার। বরং আরাম হয়।

চিন্তা করছিল সে অনেক। নতুন একটি ভাবনাকে সে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। নতুন এই ভাবনাটি তাকে উদ্বিগ্ন করে না, বিমর্ষ করে না, ভয় দেখায় না, অস্থির করে না। এই ভাবনা তাকে বল দেয়। তাকে শান্ত করে। উৎসাহ দেয়।

সে দেখতে পেয়েছে বাঘও তবে পরাজিত হয়।

রাজবাড়ির পাথরের বাঘ মহাকালের কাছে পরাজিত হয়। খেলার মাঠে বাঘের মতো কুস্তিগীর যুবকও ধানের মতো হিলহিলে যুবকের কাছে পরাজয় মানে।

হিলহিলে যুবকের চিত্রটি তার চোখে ভাসে। স্পষ্ট সে কুস্তিটি আবার দেখতে পায়। আবার ওই হিলহিলে যুবকটি এসে বলবান যুবকের উরুতে পা দিয়ে জয়ের গৌরবে হাত উর্ধ্বে তুলে ধরে। বারবার চিত্রটি তার কাছে ফিরে আসে। বারবার সে জয়ধ্বনি শুনতে পায়। রাত গভীর হয়ে পড়ে। কুস্তি তখনো থামে না।

দিঘির জল থেকে যুবতীটি আবার উঠে আসে। এবার আর তার কাছে আসে না। বৃষ্টিভেজা গাছের গুঁড়ির মতো নিতম্ব ধরে, বুকে বৃক্ষের পুরোট ফল দুটি ধরে, যুবতী দূরে অপেক্ষা করে। কিম্বা অপেক্ষা নয়, আনমনেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বস্ত্র ত্যাগ করে। ফল দুটি প্রকাশিত হয়। বস্ত্রত্যাগের তাড়নায় ফল দুটি তলতল করে ঈষৎ কাঁপতে থাকে। বিপরীতে নিতম্ব তার দেহের ভার রক্ষা করে যেন মহজানের ওজনের পাল্লায় ভারসমানের বাটখারা ওটি, যুবতী নইলে বুকের ভারে সমুখে নত হয়ে পড়ত। নাভির নিচে ত্রস্ত হাত রাখে যুবতী, পিপুলের মতো লাল দানাটিকে ঢেকে সে দাঁড়িয়ে থাকে। কেশে তখনো জলবিন্দু। ফোঁটা ধরে আছে, কিন্তু পড়ে নাই। জলবিন্দুতে রঙধনুর চমকানো রঙ ফোটে। লেবুর ঘন গন্ধ ওঠে বাতাসে।

কপিল তার সেই দ্বিতীয় ক্ষুধার সঞ্চরণ অনুভব করে শরীরে। ঘন হয়ে উঠতে থাকে তার শরীরের ভর। হৃদপিণ্ডে ষাঁড়ের দৌড় সে শুনতে পায়। সে উঠে দাঁড়ায়। যুবতীর দিকে যায়। স্থির পায়ে সে এগিয়ে যেতে থাকে। যুবতীর নিকটে সে পৌঁছুবে। তাকে সে রমণ নয় পরিক্রমণ করবে। মাঠের সেই কুস্তির মতো, সেই হিলহিলে যুবকটির মতো সে বলবানকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করবে। যুবতী তাকে জড়িয়ে ধরলেই সে বিজলির মতো পিছলে যাবে। ঝিলিক দিয়ে অট্টহাসি করবে বিজলির মতো। যুবতী মাটিতে পতিত হয়ে তার কাছে কামভিক্ষা করবে। সে তখন তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কপিল তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে। কপিল তখন তার উরুতে পা রেখে দাঁড়াবে।

দ্যাখ, মুঁই জয়ী!

কিন্তু পা তুলতে না তুলতেই যুবতী জাদুর মতো মিলিয়ে যায়। এত অকস্মাৎ সে চোখের সমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় যে কপিল ধাঁধা ঠাহর করতে পারে না। পা তার থামে না। যুবতী এখনো সমুখেই শুয়ে আছে বোধে সে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর, রাজবাড়ির ভাঙা দেয়ালে যখন তার মাথা ঠুকে যায়, সে ঘোর থেকে জেগে ওঠে। কপালে হাত দিয়ে দেখে, রক্ত! রক্তে হাত লাল হয়ে যায়। দীর্ঘ অনাহারে দুর্বল তার শরীর লুটিয়ে পড়ে ভাঙা রাজবাড়ির চত্বরের ওপর। ■